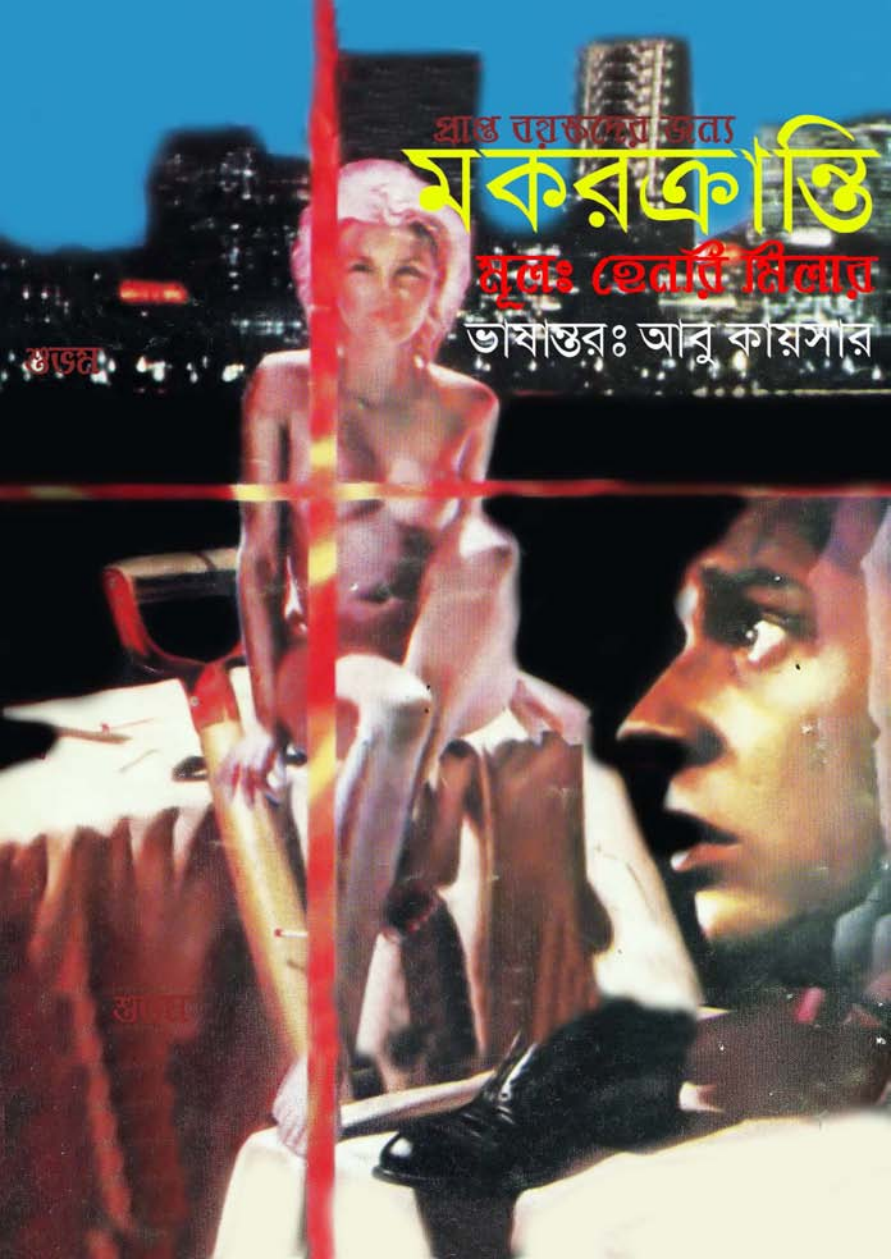
প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য

মকরক্রান্তি

মূলঃ হেনরি মিলার

ভাষান্তরঃ আবু কায়সার



আমেরিকার পচনধরা সমাজে এক যুবক বেঁচে আছে একের পর এক চাকরী নিয়ে আর ছেড়ে। পাশাপাশি এক একজন মেয়েকে সে অনায়াসে সমস্ত নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে ভোগ করছে আর পর মুহূর্তেই ছুঁড়ে ফেলছে। এরা কেউ পলিন, কেউবা লটি, কেউ ভ্যালেসকা, মনিকা, ইভলিন— এরকম অজস্র নাম।

চাকরী দেয়া, ছাঁটাই করারও তার অপরিসীম ক্ষমতা। পকেটের পয়সা সে দু'হাতে উড়িয়ে দিচ্ছে, আবার বাচ্চার দুধের টাকা যোগাড় করার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। চাকুরী আর মেয়েমানুষ দু'টোই তার প্রচণ্ড দরকার। মকর রাশির জাতক যুবক তার একটি তৃতীয় নয়ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যা দিয়ে সে জীবনকে দেখে শো-উইণ্ডের ভেতরে সাজানো মাংসের টুকরোর মতন। পৃথিবীটা যার কাছে নোংরা পচা পনির।

আর যৌনতা বা যৌনসংগম? যৌনসংগম যার কাছে নরখাদকদের চিবিয়ে খাওয়া রঙিন ফুলের উপমা কিংবা শূন্যে লাফিয়ে ওঠা ইউনিকর্ণ নামের অলীক ঘোড়া অথবা সাগরতলে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের ওপর ফসফরাসের মতো জ্বলজ্বলে কোটিপতিদের কঙ্কাল।

বিপন্ন বিস্ময়ে আক্রান্ত অথচ দেবতুল্য প্রতিবাদী তো বটেই।

কে এই যুবক? চাকরী আর মেয়েমানুষকে যে পরিত্যাগ করছে পুরোনো জুতোর মতো? কিন্তু কেন?

মকরক্রান্তি

মকরক্রান্তি

অধুনা

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

মকরক্রান্তি

হেনরী মিলার

ভাষান্তর : আবু কায়সার

শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য



অধুনা

মকরক্রান্তি

হেনরী মিলার

অধুনা

পেপার ব্যাক

প্রকাশ কাল

জুলাই/১৯৮৬

প্রকাশিকা

শিরীন চৌধুরী

৭৪,হরনাথ ঘোষ রোড

লালবাগ, ঢাকা—১১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ইউসুফ হাসান

মুদ্রণে

ঊষা আর্ট প্রেস

১২৭।১ লালবাগ রোড

ঢাকা—১

প্রাপ্তিস্থান

নসাস, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ বাংলাবাজার, কারেন্ট নিউজ, ঢাকা কলেজ গেট ঢাকা। কথাকলি, গুলিস্তান লাইব্রেরী চট্টগ্রাম। খুলনা নিউজ কর্ণার খুলনা। সঞ্চিতা রাজশাহী। মুসলিম বুক ডিপো বগুড়া। এ ছাড়াও দেশের অন্যত্র বুকষ্টল ও ম্যাগাজিন কর্ণারে খোঁজ নিন।

মূল্য : সুলভ ১৭ টাকা মাত্র। শোভন ২৬ টাকা।

নিবেদন

সমকালে যাদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই হেনরী মিলার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আছেন আমেরিকায় এবং এখনও সাহিত্যচর্চা করে যাচ্ছেন। অশ্লীল লেখক হিশেবে তাঁর কুখ্যাতি যেমন জুটেছে, শিল্পরসিকরাও তেমনি উপন্যাসে জীবনের সূক্ষ্ম উপস্থাপন দেখে তাঁর বন্দনা করেছেন।

"মকরক্রান্তি" তাঁর সবচাইতে বিতর্কিত গ্রন্থ। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমেরিকার রক্ষণশীল সমাজ অশ্লীলতার দায়ে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলো। এত ব্যাপক যৌনতা, পুরুষ-নারীর দৈহিক স্বেচ্ছাচারের ছড়াছড়ি এর আগে কোনো গ্রন্থে দেখা যায়নি। কিন্তু বিশ্বব্যাপি বিদগ্ধজনদের চাপে এর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ হয়ে পঞ্চাশ লাখেরও বেশী বই নিমেষে বিক্রী হয়ে যায়।

এই গ্রন্থের যৌন-ব্যাভিচার আসলে আমেরিকার পচনধরা সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তব দলিল এবং তার নির্মম সমালোচনা। এই ঘটনাগুলোর অন্তরালে লেখকের যে মানবিকতা, সহানুভূতি ও দরদ স্রোতের মতো বয়ে চলেছে তা যে কোনো পাঠকের মন ছুঁয়ে যাবে। অধুনা প্রকাশনীর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই আধুনিক চিরায়ত উপন্যাসটি বাংলায় উপহার দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

এক

একদা আপনারা ভূতকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তুমুল বিশৃংখলার মধ্যেও নির্বাসিত করেছিলেন এতদ-সংক্রান্ত চূড়ান্ত সত্য। শুরু থেকেই ব্যাপারটাকে বিশৃংখলা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে। বিষয়টাকে তরল পদার্থের মতোই আমি নিঃশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়েছিলাম কান্‌কো দিয়ে। তা, আমি এক রকম আচ্ছন্ন হয়েই পড়েছিলাম। চাঁদকে যেখান থেকে মনে হয় সটান আর ঘোলাটে—সেখানেও এটা ছিলো মসৃণ আর উর্বর। সর্বোপরি এ ছিলো ঘোরতর মতানৈক্য। এবং আমি সব কিছুতে উল্টোটা দেখতাম দ্রুত। দেখতাম বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যবর্তী শ্লেষ। দেখতাম আপাত বিরোধী সত্য।

আমি ছিলাম আমার পয়লা নম্বরের শত্রু এমনকি যখন আমি শিশু, যখন অভাব কাকে বলে জানিনা, তখন আমি মরতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম আত্মসমর্পণ করতে—কেননা আমি দেখেছিলাম, জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারটা স্রেফ নিরর্থক। আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম, সংসারে কোনো কিছুই প্রমাণিত, পর্যাপ্ত, সংযুক্ত কিংবা বিয়োজিত হবার নয়। আমার চারদিকে সবাই ছিলো ব্যর্থ। যারা ব্যর্থ নয়, তারা উপহাসের পাত্র। বিশেষ করে যারা সফল। এদের দেখলে ঘেন্নায় আমার কান্না আসতো। ভুলের প্রতি আমার সহানুভূতি ছিলো। কিন্তু আমার এ অবস্থার জন্যে সহানুভূতির কোনো ভূমিকা নেই। এটা ছিলো একটা নেতিবাচক ব্যাপার। একটা দুর্বলতা, যা মানবিক-দুর্বিপাকে প্রস্ফুটিত হতো। কেউ কোনদিন ভালো কিছু করবে, একথা ভেবে আমি কখনো কাউকে সাহায্য করিনি। আমি সাহায্য করেছি কেননা এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিলো না। কোনো কিছু বদলে দেবার ধারণাটা আমার কাছে মনে হয়েছে নিরর্থক। কোনো কিছুই তো আসলে বদলানো যায় না। অবশ্য হৃদয় বদলের ব্যাপারে আমি এক সময় প্রভাবিত হয়েছিলাম। মানুষের হৃদয় কে বদলাতে পারে! অবশ্য বন্ধুরা পরিবর্তিত হতে পারে যখন তখন। ঈশ্বর, যে টুকু আমার মধ্যে ছিলো, তার চেয়ে বেশী আর দরকার ছিলো না। যখন দরকার হতো, আমি মনে মনে সংকল্প করতাম, তাঁর সঙ্গে দেখা করবো এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করবো।

সবচেয়ে খারাপ লাগতো আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যাশাকে।

কি ? না, আমাকে হতে হবে দয়ালু, দানশীল, অনুগত আর বিশ্বাসী। সম্ভবত ওই সব গুণের ভ্রূণ আমার মধ্যে তারা লক্ষ্য করে থাকবে। হয়তো আমার ব্যাতিক্রমধর্মিতার জন্যেই তাদের এরকম মনে হতো। অবশ্য যতোদিন আমার ভেতরে হিংসা দ্বেষ জন্মায় নি, ততোদিন পর্যন্ত ওই সদ গুনাবলীর অধিকারী আমি ছিলামও। হিংসা আমাকেও কেউ কখনো করেনি। আমিও কাউকে নয়। বরং আমি সবসময় সবার প্রতি, সব কিছুর প্রতি করুণাই বোধ করেছি।

গোড়াতেই আমি নিজেকে এরকম ভাবে তৈরী করেছিলাম, যে অন্ধের মতো কিছু চায়না। আমি কাউকেই সঙ্গে চাইনি, কেননা আমি চেয়েছিলাম বন্ধনহীন হতে। চেয়েছিলাম কেবল নিজের খেয়ালের খেলায় ব্যস্ত থাকতে। আমি শুরুতেই ছিলাম নষ্ট। তার কারণ ছেলেবেলায় আমার মা আমাকে বিষ খাইয়েছিলো। যে বিষ আমি স্তন্য পান ছাড়ার পরেও আমাকে আর ছেড়ে যায়নি। মা যখন তার সন্তানের মুখ থেকে সুধা প্রত্যাহার করে নেয়—সব শিশুই তখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্বই দিইনি। আমি শৈশবেই ছিলাম দার্শনিক। নীতি গত ভাবে আমি ছিলাম জীবন বিরোধী। কি নীতি ? নিস্ফলতার নীতি।

আমার চার পাশে সবাই খুব হেনস্থা পোহাচ্ছিলো। অবশ্য এজন্যে আমি দায়ী নই। দায়ী যদি আমাকে করাও হয়—আমি বলবো, অপরের আনন্দের ফলশ্রুতি আমি। আমি কাউকে ধাক্কা দিইনি। শুনেছি, আমায় জন্মগ্রহণ যথেষ্ট বিলম্বিত হয়েছিলো। আমি সব-কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারি। মাতৃ জরায়ুর মতো অমন উষ্ণ

আশ্রয় থেকে কে বেরুতে চায় বাইরের ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে, তুষারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে? মানুষ এরকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করে কি ভাবে? তার কারণ তারা মূর্খ। তারা ভীতু। আমি তো দশ বছরে পড়বার আগে বুঝতেই পারিনি, দুনিয়ায় অনেক উষ্ণ দেশ আছে।

ঠাণ্ডা দেশের মানুষেরা বেধড়ক খাটে। আমার পূর্ব পুরুষরা ছিল নর্ডিক—যাদের আহাম্মক ছাড়া আর কিছুই বলা যায়না। ভুলের একটা স্তূপের নিচেই তারা বসবাস করে গেছে—একথা অনুমান করা যায় অনায়াসে। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তারা ছিলো প্রায় শুচিবাই গ্রস্ত। তারা ছিলো বেদনাদায়ক ভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু তাদের ভেতরটা? তারা কস্মিণকালেও তাদের আত্মার দুয়ার উন্মোচন করেনি। নৈশভোজের পর তারা থালা-বাসন সাফসুতরো করে তুলে রাখতো তাকে। পড়া হয়ে গেলে নিখুঁত ভাবে ভাঁজ করে শেলফে তুলে রাখতো খবরের কাগজ। কাচা কাপড় রোদে শুকিয়ে চমৎকার ভাবে ইস্ত্রি করে তা ভরে ফেলতো ড্রয়ারে। অর্থাৎ সবকিছু সেই আগামীকালের জন্যে। কিন্তু হায় আগামীকাল আর কখনো আসেনি। বর্তমানটা তাদের কাছে ছিলো যেন একটা সেতু—যার ওপর তারা আবর্তিত হতো—যেমন মহাশূন্যে আবর্তিত হয় পৃথিবী। কিন্তু ব্রীজটাকে উড়িয়ে দেবার কথা বোকারা কখনো ভাবেনি।

দুঃসময়ে নিজের বদলে আমি ওদেরকেই ধিক্কার দেবার উছিলা খুঁজি। কেননা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমিও প্রায় ওদের মতোই।

বহুদিন আমি মনে মনে চিন্তা করেছি। আমি নিজের মুক্তি কামনা করেছি। কিন্তু এক সময় দেখেছি, আমার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে। আমি ওদের চেয়েও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার জীবনের পরিবর্তন সম্ভব নয়। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে যখন আমি তাকাই দেখি, আমি নিজে থেকে কোনো অন্যায় করিনি। যেটুকু করেছি তা অন্যের তাগিদে। লোকে মনে করতে পারে আমি গোঁয়ার, বেপরোয়া। অনুমানটা একেবারে মিছে নয়। আমার নর্ডিক পূর্বপুরুষরাও ছিলো দুঃসহসী। যদিও 'দুঃসাহস'—এই শব্দটি তারা আদপেই চিনতো না। একদা সারাটা দুনিয়া তোলপাড় করেছিলো তারা। দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলো নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর। অগনিত ধ্বংসাবশেষ তার সাক্ষী। তারা ছিলো নিরবছিন্ন পরিশ্রমী—কিন্তু গোঁয়ার নয়।

কিন্তু আজ? আজকের দিনে তারা এ দুনিয়াতে বসবাসের অযোগ্য। এমন কি এই আমিও ঠিক তাই। কেননা হালফিলের দুঃসাহসী অভিযাত্রা একটাই—নিজের দিকে অগ্রসর হওয়া—নিজেকে জানা। আর এ ব্যাপারে সময়, শূন্যতা এমন কি দলিল-দস্তাবেজের কোনো প্রশ্ন নেই। একটা সময় ছিলো, যখন প্রায়শ আমি এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছি। আবিষ্কার করতে চেয়েছি নিজেকে। কিন্তু আমার নিজস্ব স্বভাবের কারণেই তাতে ঘটেছে আকস্মিক-বিরতি। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখেছি, আমার চিন্তার দৌড় সামান্য। আমি কেবল ভাবতে পারি আমার চেনা রাস্তা, পরিচিত

পরিবেশ আর সেখানে বসবাসকারী লোকদের নিয়েই। আমি আমেরিকার এমন একটি জায়গা বা তার বাসিন্দাদের কথা ভাবতে পারিনা—যেখান দিয়ে হেঁটে নিজেকে আবিষ্কার করার গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব।

দুনিয়ার অনেক দেশের অনেক রাস্তায়ই আমি হেঁটেছি। কিন্তু আমেরিকার রাস্তার মতো বিচ্ছিরি রাস্তায় কখনো হাঁটি নি। নিজেকে এমন নিরর্থক আর অগোছাল মনে হয়নি অন্য কোথাও। আমেরিকার রাস্তাগুলো যেন ময়লা পানির এক বিশাল গামলা। সেখানে যাবতীয় ক্লেদ নর্দমাবাহিত হয়ে শেষটায় অনিঃশেষ মলভাণ্ডে থিতু হয়। সেই গামলার ওপর যাদু দণ্ডটি কে নাচায়? তার নাম কর্মস্পৃহা। যাদু দণ্ড নাচছে—ফলে প্রাসাদ আর কারখানা গড়ে ওঠে পাশাপাশি। গড়ে ওঠে সমরাস্ত্র প্রকল্প, রাসায়নিক শিল্পসংস্থা স্টীল-মিল, স্যানাটোরিয়াম, জেলখানা আর পাগলা-গারদ।

গোটা মহাদেশটাই যেন এক দুঃস্বপ্ন। যেখানে বিপুল পরিমানে তৈরী হচ্ছে দুঃখ দুর্দশা আর দুর্বিপাক। পরিসংখ্যানগত সুখ আর পরিসংখ্যানগত ঐশ্বর্যের এই বিশাল সমাবেশে আমিই একমাত্র বাস্তব সত্ত্বা। কিন্তু এখানে আমি একটি মানুষও খুঁজে পাইনি যে প্রকৃত সম্পদশালী বা সত্যিকার সুখী।

আমি যদি আমার বিক্ষুব্ধ এই বুকখানাকে চিরে দেখাতে পারতাম —কিঞ্চিত শান্তি পেতাম। যদি এজন্যে আমি জেলে গিয়েও পচতাম—সে-ও ছিলো ভালো। যিনি জীবনে কারো কোন ক্ষতি

করেন নি, সেই প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলিকে পাগলা জলগোজের মতো যদি গুলি করতে পারতাম। আমি এরকম কথা চিন্তা করি কেন ? তার কারণ আমার মনের মধ্যে বসে আছে এক গুপ্ত-ঘাতক। আমি দেখতে চেয়েছিলাম আমেরিকা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাক। আমি এজন্যেই এটা চেয়েচিলাম, এখানে আমার এবং অন্যদের বিরুদ্ধে নানা অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে এবং আমরা কখনো এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারব না।

আমি ছিলাম অশুভ মৃত্তিকার অশুভ প্রজন্ম। আমার নিজস্বতা যদি অক্ষয় না হতো, আমি কবে নিঃশেষ হয়ে যেতাম! কারো কারো কাছে এটাকে মনে হবে আবিষ্কারের মতো। কিন্তু আমি যা হবো বলে ভেবেছি, তা সত্যি হয়েছে —অন্তত আমার বেলায়। ইতিহাস একে অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারে, কেননা সেখানে আমার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু আমার সব কথা ভুল হলেও; মিথ্যা এবং বিষাক্ত হলেও—এটা সত্য। এবং একে গলধকরণ করতে হবে।

আমি সারা জীবনে যা চেয়েছি, তা হলো বেঁচে না থাকা। এখনো কি বেঁচে আছি ? মনে ইয় বেঁচে থাকা অনেকটা এই রকমই। ছ' অথবা সাত বছর বয়সে আমি একদিন আমার দাদার পাশে পড়তে বসেছিলাম। কিন্তু আমার বইয়ের দিকে মন ছিলনা তখন। আমি ওয়ার্ক বেঞ্চে বসে তাঁকে নিবিষ্ট ভাবে কাজ করতে দেখছিলাম। কখনো সেলাই করছিলেন। কখনো গরম ইস্ত্রি চালিয়ে পাট করছিলেন কোটের কানাত। আবার হয়তো বা

এক কবজির ওপর হাতের আর এক কবজি রেখে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিলেন বাইরের দিকে। আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম তাঁর মুখের অভিব্যক্তি। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তাইতো, দাদা কী ভাবছেন অমন করে। কী এমন সে ভাবনা, যা তাঁকে অমন স্বপ্নাতুর, অন্যমনস্ক করে তুলছে। পড়ায় আমার মন বসলো না—এমন কি রাস্তায় নেমে খেলাধুলোয় মত্ত হতেও ইচ্ছে হলো না এক বিন্দু। আমি তখনো স্বপ্ন দেখতে শিখিনি। তবে দাদার দিবাসপ্ন আমাকে তীব্র ভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। মনে হচ্ছিল, কী করছেন সে সম্পর্কে খুব একটা খেয়াল নেই এখন দাদার। এ মুহূর্তে আমাদের কারো কথাই তিনি ভাবছেন না। তিনি এখন একা। এবং যেহেতু একা তাই মুক্ত।

আমি অবশ্য একা ছিলাম না কখনো। এমনকি একা যখন থাকতাম, তখনো একা মনে হতো না নিজেকে। আমার সব সময় মনে হতো আমি আছি আরো অনেকের সঙ্গে। আমি যখন সুখী হতাম, মনে হতো সবাই সুখী। আবার আমার দুঃখের সময় মনে হতো গোটা দুনিয়াটাই কাঁদছে। অবশ্য কাঁদতাম আমি খুব কম। হাসতামই বেশী। দারুণ সময় ছিলো বটে সেটা। দারুন বলছি এজন্যে, যে, কোনো কিছুর তোয়াক্কা করতাম না তখন। নিজের নিরীখেই সব কিছুর যাচাই বাছাই বিচার-বিবেচনা করতাম আমি। এটা আমাকে প্রভাবিত করেছিলো গভীর ভাবে। সংসারে মন্দ কি? না, সবাই যে জিনি-

ষটাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দেয়। এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম আমি খুব ছেলেবেলায়। যেমন ধরা যাক আমার বন্ধু জ্যাক লসনের ব্যাপারটাই।

ঝাড়া একটি বছর ধরে বেচারা শয্যাশায়ী। খারাপ অসুখ হয়েছিলো তার। খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো সে আমার। অন্তত লোকে ঢালাও ভাবে একথাই বলতো। যাই হোক, প্রথমটায় আমি ওর অসুখের জন্য বেশ চিন্তিত ছিলাম। উদ্বিগ্ন আর কি। ঘন ঘন ওর বাড়িতে ওকে দেখতে যেতাম আমি। কিন্তু একমাস অথবা দুমাস পর হঠাৎ ওর অসুস্থতাকে আমার বিরক্তিকর মনে হতে লাগলো। মনে মনে বললাম, মরছে না কেন জ্যাক। মরলেই তো লেঠা চুকে যায়। ভাবলাম, যতো তাড়াতাড়ি ও মারা যাবে, ততোই ভালো। আর একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য—তার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম আমি। বস্তুতঃ তাকে সঁপে দিলাম অদৃষ্টের হাতেই।

আমার বয়েস তখন মাত্র বারো। মনে আছে, তাকে ভুলতে পেরে তামি গর্ব অনুভব করছিলাম। ওর দাফনের ঘটনাটাও ভুলিনি। উহ্—কী মর্মান্তিক ব্যাপার। ওর বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয় পরিজনরা অসুস্থ বাঁদরের মতো চ্যাঁচামেচি করছিলো। বিশেষ করে ওর মা-টা ভীষণ কাঁদাকাটা করছিলেন। মহিলা ছিলেন আবার খানিকটা আধ্যাত্মিক টাইপের। গোঁড়া খৃষ্টান বলতে যা বোঝায়। অসুস্থতা বা মৃত্যু—এ দুটোর কোনটিতেই তার বিশ্বাস ছিলো না। ফলে তাঁর আহাজারি এমন এক উঁচু

পর্দায় উঠলো যা শুনে খোদ যীশু খৃষ্টেরই কবর থেকে উঠে আসার অবস্থা। কিন্তু না, তার আদরের ধন জ্যাক আর জ্যান্ত হলো না। স্থির, ঠাণ্ডা, দীপ্তিহীন মৃতদেহ। বেঁচে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমি বেশ স্বস্তি অনুভব করছিলাম। আমার চোখে এক ফোঁটা পানিও এলো না। আমি তার গুণাগুণ নিয়ে আদপেই মাথা ঘামাচ্ছিলাম না, কেননা সে অদৃশ্য হয়েছে। আর সঙ্গে করে নিয়েও গেছে নিজের এবং তার জন্যে পাওয়া অন্যদের যন্ত্রনা। 'আমিন'! আমি উচ্চারণ করলাম মনে মনে এবং কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে খানিকটা চেঁচিয়েও ফেললাম মৃগী রোগীর মতো।

এই ঘটনার কথা আমি এজন্যেই ভুলিনি যে, এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার প্রথম প্রেমের স্মৃতি। ব্যাপারটাকে আমি গুরুত্ব দিইনি। যদি দিতাম, তাহলে আজ আর এসব কথা লেখার অবকাশটুকু থাকতো না। হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে মারা যেতাম। বস্তুতঃ এ ছিলো এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। আর এ অভিজ্ঞতাই আমাকে শিখিয়েছিলো, কীভাবে মিথ্যার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। এ থেকেই আমি শিখি, যখন হাসির সময় নয় তখন হাসতে। যখন কাজে বিশ্বাস নেই তখন কাজ করতে এবং যখন বেঁচে থাকবার কোনো দরকার নেই, তখন বেঁচে থাকতে। এমন কি যখন আমি তাকেও ভুলে গেছি, তখনো ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার কায়দাটা আমি ভুলিনি।

যুদ্ধ সম্পর্কিত সবকিছুর দোষারোপ করা একটা চলতি রীতি।

আমি বলি যুদ্ধের কারণে আমার কিছু যায় আসেনি। যখন অন্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলো, আমি তখন একটার পর একটা বাজে চাকরি নিচ্ছিলাম। ইস্ চাকরি বটে। চাকরির কী ছিরি। শরীর এবং আত্মাকে কাছাকাছি আনবার কোনো অবকাশ ছিলো না সেসব অকিঞ্চিৎকর জীবিকায়। তখন চোখের পলকে যেমন আমার চাকরি জুটতো, তেমনি ভোজবাজির মতোই আমার তা চলে যেতো। বুদ্ধিমত্তায় ঘাটতি ছিলো না আমার। কিন্তু আমি আমার ওপর অপরের আস্থাহীনতাকে উৎসাহিত করতাম।

আমি যেখানেই চাকরি নিয়েছি—ঢিলেমি ছিলো আমার অপরিবর্তনীয় অভ্যাস। অবশ্য হলফ করে বলতে পারি, আমি অলস নই, অলস ছিলাম না। প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম একটা সার্চ-লাইট, যাবতীয় ভণ্ডামী আর নিষ্ফলতাকে যা উদঘাটন করে দেয়। আমি পারঙ্গম ছিলাম না খোঁচাখুচিতে। এটা আমাকে চিহ্নিত করেছিলো নিঃসন্দেহে। চাকরির জন্যে যার কাছে গিয়েছি, সে আমার মুখ দেখেই আঁচ করতে পেরেছে লোকটা বেপরোয়া। চাকরি হোক বা না হোক তাতে তার কিছু যায় আসে না। ফলে চাকরি হতোও না। কিন্তু গ্রহের ফেরে এক দিন হেলাফেলায় ওই চাকরি খোঁজাটাই একটা নিয়মিত কার্যক্রমে, একটা অবসর বিনোদনে পরিণত হতো আমার।

আমিই ছিলাম আমার বস। কিন্তু অন্য বসদের থেকে আলাদা। কেননা আমার ভালোমন্দের জন্যে দায়ী ছিলাম আমি নিজে। আমি কোন কর্পোরেশান, ট্রাস্ট, রাষ্ট্র, নেতৃত্ব কিংবা জাতীয় নীতি—

কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রক ছিলাম না। নিজের বিনষ্টি, নিজস্ব কপর্দকহীনতা আমি নিজে ডেকে এনেছি। ঈশ্বরের অধিক যদি কিছু থেকে থাকে—আমি ছিলাম তাই-ই!

যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি ছিলাম এই রকমই। কিন্তু একদিন ফাঁদে পড়লাম। এমন দিন এলো, যখন আমি পাগলের মতোই একটা চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। চাকরির বড়ো দরকার আমার। তার এক মিনিট সময় নষ্ট করার উপায় নেই। আমি ঠিক করলাম, পৃথিবীর শেষ চাকরিটাই এবার নেবো। মেসেঞ্জার—বয় বা বার্তাবাহকের চাকরি। যেমন ভাবা, তেমন কাজ। উত্তর আমেরিকার কসমোডেমোনিক টেলিগ্রাফ কোম্পানির এমপ্লয়মেন্ট ব্যুরোতে গিয়ে সোজা হাজির হলাম। তখন অফিস বন্ধ হয়-হয়। সদ্য বেরিয়েছি পাবলিক লাইব্রেরী থেকে। আমার বগলে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দুটি বই। একটি অর্থনীতি বিষয়ক অন্যটি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত। যে লোকটা আমাকে হাঁকিয়ে দিলো, সে উবু হয়ে বসে কাজ করছিলো সুইচ বোর্ডে। ব্যাটা বোধ হয় আমাকে কলেজের ছাত্র ভেবেছিলো। যদিও দরখাস্তে যা লেখা ছিলো, তাতে বুঝতে অসুবিধে নেই আমি স্কুল ছেড়েছি অনেক দিন আগেই। দরখাস্তে আমি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্বলজ্যান্ত একটা পি, এইচ, ডি ডিগ্রিতে নিজেকে সম্মানিত করেছিলাম। সবকিছু এড়িয়ে গেলো তার চোখ। অথবা সে কিছু সন্দেহ করে থাকবে। লোকটা আমাকে সোজা বের করে দিলো অফিস থেকে। আমি তো মহা-খাপ্পা। আমার ক্রুদ্ধ হবার কারণ, জীবনে আর একবার আমি বিনীত হয়েছিলাম এই আজ।

কেবল তাই নয়। আমি আমার অহঙ্কারকেও চেপে রেখেছিলাম। কিন্তু হেনরী ভি,মিলার নামধারী এমন একটা উঁচুস্তরের লোককে এতোটা নিচু কাজ তারা দিতে চায়না—এই বদামিটা আমার কাছে হয়ে উঠেছিলো অসহ্য।

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম খোশ মেজাজে। শেভ করলাম। তারপর সবচেয়ে ভালো পোষাকটি পরে গট গট করে হাঁটা দিলাম সাবওয়ে ধরে। টেলিগ্রাফ কোম্পানির সদর দফতরে পৌঁছতে খুব একটা দেরী হলো না আমার। সম্ভবত পঁচিশ তলাতেই ছিলো কোম্পানির প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্টর খাস কামরা। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলাম না—কেননা সে সময় তিনি শহরের বাইরে। আমি ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আদৌ উৎসাহী ছিলাম না। কিন্তু তাঁর সেক্রেটারীটা বেশ অমায়িক লোক। মনে হলো, বুদ্ধিবিবেচনা কিছু আছে। আমি তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম যথাসম্ভব সংক্ষেপে।

যখন তিনি জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ফোন করবার জন্য রিসিভার তুললেন, আমি ভাবলাম, এখানেই সব শেষ। তার কারণ আমাকে এখন এমন একজনের কাছে হয়তো পাঠানো হচ্ছে, যেখান থেকে ক্রমাগত নতুন নতুন লোকের টেবিলে আমাকে লাট্টুর মতো পাক খেতে হবে এবং যতোক্ষণ না আমি রণেভঙ্গ দিচ্ছি ততোক্ষণ চলতে থাকবে এই ধ্রুপদ প্রক্রিয়া। কিন্তু তাঁর সংলাপ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

খানিকটা দূরেই, অন্য একটা অফিসে বসেন জেনারেল ম্যানেজার। আমি তাঁর রুমে ঢুকলাম। তিনি আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম বলে মনে হলো। আমি চামড়ায় মোড়ানো আরাম দায়ক চেয়ারে বসে, সামনে বাড়িয়ে ধরা বৃহদাকার চুরুট নিয়ে তাতে অগ্নি-সংযোগ করলাম। ভাবসাবে মনে হলো, এর কাছে আমার ব্যাপারে কড়া সুপারিশই এসেছে। আমার পাশে বসে ছিলো একটা লোক, যার নাম হাইম। পদ এমপ্লয়মেন্ট-ম্যানেজারের সহকারী। জি, এম, সাহেব এই নোংরা লোকটার হাতে আমাকে সঁপে দিলেন। অবশ্য তিনি হাইমের সামনেই বললেন, তাদের বার্তাবহ-বাহিনীতে এই পচা লোকটা প্রচুর ইহুদী ঢুকিয়েছে। কথাবার্তায় জানা গেলো, মিঃ বার্নস নামে যে লোকটি এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজার হিসেবে সানসেট প্লেস নামধারী অফিসটাকে বিগত ত্রিশ বছর যাবৎ আলোকিত করে রেখেছেন—তাঁর বয়েস হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি হয়ে পড়েছেন অলস। কাজেই তাঁর জায়গায় ।

বৈঠক চললো বেশ কয়েক ঘন্টা। জেনারেল ম্যানেজার মিঃ ক্ল্যানসি আমাকে জানালেন, তোমাকে শিগগীরই সানসেট প্লেসের। বস্ বানিয়ে দেয়া হবে। তবে তার আগে তোমাকে করতে হবে বিশেষ বার্তাবাহকের কাজ। না, না, ফালতু মেসেঞ্জার নয়—বিশেষ বার্তা-বহ। অবশ্য আমাকে দেয়া হবে এমপ্লয়মেন্ট-ম্যানেজারের বেতনই। তবে এ বেতন দেয়া হবে বিশেষ তহবিল থেকে। তা, এই বিশেষ দায়িত্বটি কি ? জানা গেলো. আমাকে নিউ ইয়র্ক নগরীতে কসমোডে-মোনিক কোম্পানির একশো একটা অফিসের যাবতীয় গুমোর খবর

পাচার করতে হবে তাঁর বাড়িতে। এক কথায় স্পাইং। জি, এম, সাহেব বললেন, অবশ্য আস্তে আস্তে তোমাকে বসিয়ে দেয়া হবে সান সেট প্লেসে। পাকাপাকি ভাবে। ভালো কাজ দেখালে উন্নতি ঠেকায় কে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি এমন আবেগ নিয়ে কথা বলছিলেন, যেন, আমাকে একদিন জেনারেল ম্যানেজারই বানিয়ে দেয়া হবে। অথবা ভাইস প্রেসিডেন্ট! আমি অবশ্য জানি, সব সম্ভবনাই চাপা পড়ে আছে ঘোড়ার গুয়ের স্তুপের নিচে। তবু বললাম—ঠিক আছে।

দুই

কয়েক মাসের মধ্যেই আমি সানসেট প্লেসে যথারীতি সমাসীন। হ্যাঁ, এমপ্লয়মেন্ট ম্যানেজার পদেই। আমার কী দোর্দণ্ড প্রতাপ! আমি একটা দানোর মতোই লোককে চাকরি দিচ্ছিলাম আর বরখাস্ত করছিলাম। পাইকারি ভাবে।

ওহ্ খোদা, এ যেন একটা কসাইখানা। আসলে পুরো ব্যাপারটা আগাপাশতলা ছিলো আহাম্মকি। মানুষ, বস্তু আর বিষয়াবলীর এক বিশাল অপচয়। বিপুল বিনষ্টি। কিন্তু যেহেতু আমি চাকরির শর্ত মেনে নিয়েছি, তাই যথাকর্তব্য পালন ছাড়া আমার আর কোনো উপায়ও ছিলো না। জি হুজুরী করতে করতে পেকে গেলাম

যাহোক। আসলে পুরো সিস্টেমটাই ছিলো অমানুষিক। অকল্পনীয় ভাবে দুর্নীতি-দুষ্ট আর জটিল তো বটেই। এমন কোনো প্রতিভাই ছিলো না, যার পক্ষে এই পচন নিরোধ সম্ভবপর। গোটা মার্কিনী-শ্রমের বিশাল অবক্ষয়ের আমি ছিলাম এক সাক্ষী-গোপাল। বস্তুতঃ আমি ছিলাম গাড়ির পঞ্চম চাকা, যার কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং যার দরুণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা ষোল আনা।

সানসেট প্লেসের ছোট্ট দাঁড়ে বসে আমি যেন গোটা মার্কিনী সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা দেখতে পেতাম। এ যেন একটা অতিকায় টেলিফোন গাইডের পৃষ্ঠা। বর্ণনাক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিকভাবে পরিপাটি করে সাজানো। কিন্তু এ রকম মনে হয়, যখন পাতাগুলো বন্ধ থাকে। কিন্তু যখন তুমি প্রতিটি পৃষ্ঠা পৃথক পৃথক ভাবে খুঁটিয়ে দ্যাখো, প্রতিটি নাম-ঠিকানা পরীক্ষা করো—তখন একেক-জনের স্বরূপ দেখে ঘেন্নায় শিউরে ওঠো তুমি। তালিকাভুক্ত লোকটি যে বাতাসে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে, যে জীবন যাপন করছে, যে সুযোগের ঝুঁকি নিচ্ছে, তার সবটাই কী নীচ, কী অসঙ্গত। কী রকম দুঃখজনক, নির্বোধ আর নৈরাশ্য জনক।

যেন তুমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এবং সেইখানেই তুমি খুঁজে পাবে মার্কিনী-জীবন যাত্রার এক পূর্ণাঙ্গ ছবি। অর্থনীতি, রাজনীতি, আধ্যাত্মিকতা, শিল্প পরিসংখ্যান, স্বাস্থ্য—সব-সব কিছু! মিলিতভাবে যা দেখতে অনেকটা দগদগে ক্যান্সারে আক্রান্ত এক শ্রান্ত লিঙ্গের মতো। কিংবা তার চেয়েও কদাকার। অবশ্য এখানে আমি শিশ্নের উপমা এ জন্যেই টানলাম

যে এর চেয়ে প্রিয় জিনিষ মানুষের কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু তা যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়? প্রশ্ন তো এখানেই। এককালে হয়তো বস্তুটি ছিলো তাজা মোরগের ঘাড়ের মতোই তেজী-টগবগে। সে একদিন সত্যি সত্যিই কিছু উৎপাদন করেছে। কেননা তার মধ্যে ছিলো স্পন্দন। এক লহমার জন্যে হলেও সে তৃপ্তিদান করেছে। দিয়েছে রোমাঞ্চ। কিন্তু এখানে বসে আমি যা দেখি, তা পোকা কিলবিল করা পচা পনিরের চেয়েও জঘন্য। বক্ষ্যমান রচনায় আমি অতীত কালকে ব্যবহার করেছি নানা বিবেচনার পর। কিন্তু অবস্থা কি ইদানীংও খুব একটা পাল্টেছে? বরং আরো খারাপ হয়ে পড়েছে পরিস্থিতি।

একবার অনেকগুলো পিয়ন নিয়েছিলাম অফিসে। সেই সময় আমার পরিচয় হয় ভ্যালেসকার সঙ্গে। অফিসে পৌঁছতে রোজই দেরী হয়ে যেতো আমার। গিয়ে দেখতাম হাইম হিমসিম খাচ্ছে। সত্যি, কুলিয়ে উঠতে পারছে না বেচারা। রুমে ঢুকে মাথা থেকে টুপিটা খুলবার আগেই আমাকে এক গাদা টেলিফোনের জবাব দিয়ে নিতে হতো। আমার টেবিলে টেলিফোন-সেট ছিলো তিনটে। এবং তিনটেই বেজে উঠতো এক সঙ্গে। আমি চেয়ারে বসবার আগেই কথা বলতে বলতে আমার মুখের কষে ফেনা জমে উঠতো। বিকেল পাঁচটা কিংবা ছ'টা পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থা। কোনো হেরফের নেই। অবশ্য হাইমের হাল ছিলো আরো করুণ। ঠিক সকাল আটটায় সে উবু হয়ে বসতো সুইচ বোর্ডের সামনে। তারপর ভাড়াটে মেসেন্‌জারদের হাতে হাবুডুবু খেতে থাকতো সে-ই

বিকেল ছ'টা অব্দি।

তা, এই ভাড়াটে মেসেনজার ব্যাপারটা কি? কথাটা খোলাসা করে বলা দরকার। কোম্পানির একশো একটা শাখার কোনোটিতেই স্টাফ ছিলো না প্রয়োজনীয়-সংখ্যক। কাজেই, প্রায়শ কেন, নিয়মিত ভাবেই দরকার হতো ঠিকে-মেসেনজারদের। হাইম যখন ভাড়াটে সামলাতে ব্যস্ত তখন তার চেহারাটা হতো দেখবার মতো। আবার ওদের সঙ্গেই যখন সে দাবা খেলতে বসতো, আমি ওর সুইচ বোর্ডের ফুটোয় ফুটোয় প্লাগ লাগাতাম পাগলের মতো। বিস্ময়ের ব্যাপার, অফিসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করেও দেখেছি—অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। বরং অবনতিই ঘটেছে। খুব সম্ভব মোট স্টাফের শতকরা বিশ ভাগ ছিলো খাটিয়ে, বাকিরা অকম্মার ধাড়ি। পরিশ্রমী মেসেনজাররা সপ্তাহে রোজগার করতো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ডলার। কখনো বা ষাট-সত্তরও। বলাবলি হতো, এরা কেরানীদের চেয়ে, এমনকি কখনো কখনো নিজেদের ম্যানেজারের চাইতেও বেশী কামায়।

কিন্তু ব্যাটাদের বেশির ভাগই হপ্তায় টেনেটুনে কামাই করতো দশ ডলার বড়ো জোর। এদের মধ্যে এমন লোকও ছিলো, যারা ডিউটি শুরু করার এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতো। যাবার আগে টেলিগ্রামের গোছা ছুঁড়ে ফেলে যেতো ডাষ্টবীনে কিংবা ড্রেনে। আর কাজ ছেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা দাবী করতো নিজেদের পাওনা—যা তাৎক্ষনিক ভাবে মেটানো ছিলো প্রায় অসম্ভব। কেননা ওই বিচিত্র হিসাব রক্ষন-পদ্ধতিতে একটা লোকের

কতো প্রাপ্য হলো তা ঠিকঠাক জানতে হলে অন্তত দশদিন সময়ের দরকার।

শুরুতে আমি সব দরখাস্তকারীকে ডেকে জড়ো করতাম। তারপর এই কাজের খুঁটিনাটি নিয়ম কানুন তাদের কাছে খুলে বলতাম। যে পর্যন্ত না আমার গলার স্বর বসে যেতো—আমি বক্তৃতা চালিয়ে যেতাম উৎসাহের সঙ্গে। কিন্তু সে ছিলো আসলে এক নিষ্ফল প্রয়াস। বেশীর ভাগই মিথ্যুক। এদের অনেকেই পুরনো পাপী। আগেও এখানে কাজ করে গেছে। কারো চাকরি চলে গেছে। কেউ পালিয়েছে। কেউ বা এখানকার চাকরিকে ব্যবহার করেছে অন্য চাকরি বাগাবার সিঁড়ি হিসেবে। কেননা এরকম শয়ে শয়ে অফিসে তাদেরকে টেলিগ্রাম বয়ে নিয়ে যেতে হতো, যেখানে পা দেয়া তাদের জন্যে ছিলো অসম্ভব।

ভাগ্যিস, অফিসে বহাল ছিলো পুরনো কর্মচারী ম্যাক গভার্ণ। ওর চোখকে বলা হত ক্যামেরা-চোখ। পুরনো পাপীদের অনেকেই ওর কাছে ধরা পড়ে যেতো। তা ছাড়া আমার হাতের কাছে ছিলো মোটা সোটা একটা লেজার, যা অনেকটা পুলিশ রেকর্ডের মতোই। খাতার বেশির ভাগ নামই ছিলো লাল কালির দাগে ভর্তি। আমি এদের সম্পর্কে ছিলাম হুঁশিয়ার। বেশির ভাগ লোকই চিহ্নিত ছিলো তাদের চুরি-বাটপাড়ি আর মিথ্যাচারের জন্যে। অবশ্য আমি ওসব নিয়ম কানুন সম্পর্কে যদি বেশি খুঁতখুঁতে হতাম, ভায়াটে লোক একটাও পাওয়া যেত না। মোট কথা, গোটা সিষ্টেমটাই ছিলো যাচ্ছেতাই রকমের বাজে। কিন্তু সিষ্টেমের সমালোচনা

করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ ছিলো যাকে বলে—হায়ার অ্যাণ্ড ফায়ার।

আমি ছিলাম গ্রামোফোন রেকর্ডের ঠিক মাঝখানটায়। আর আমার চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো চোর জোচ্চোর, ভবঘুরে, নিগ্রো, ইহুদী, বেশ্যা এবং কারা নয়? ঘ্যাগের ওপর নেকলেসের মতো, মাঝে মধ্যে আবার শুরু হতো ধর্মঘট। চলতো লক-অউট। হৈ চৈ গোলমাল। চাকরি-চ্যুতি। মানবিক বিপর্যয়। সত্যি সে এক বিচিত্র চিড়িয়াখানা। এই চিড়িয়াদের সামাল দিতে যে কোনো ধৈর্যশীল মানুষ ও হিমসিম খেয়ে যাবে। এমন কি পাগল হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। হাইম যখন ওদের মধ্য থেকে ঝাড়াই বাছাই করতো—ওদের সামলাতো, আমি তখন সামাল দিতাম ওর সুইচ বোর্ড। কিন্তু আসলে ঝাড়াই বাছাই কি সম্ভব ছিলো? কিংবা কাজের ফিরিস্তি ঠিক ভাবে নেয়া?

ভাবুন একবার ব্যাপারটা। কেউ হয়তো গিয়েছে টেলিগ্রাম বিলি করতে। সে কবে আসবে কিংবা আদৌ ফিরে আসবে কিনা—কোনো নিশ্চয়তা নেই। কাজ টাজ শিকেয় তুলে কেউ দিনভর ওঠা নামা খেলতো সতশ্চল সিঁড়িতে। কেননা তার পরণে আছে চেনা ইউনিফর্ম। সিঁড়ি দিয়ে হাজারবার ওঠা নামা করলেও পয়সা লাগবে না। আবার কেউ বা ডিউটিতে বেরিয়েই হঠাৎ ভাবতো—দুত্তোরি তোর পিয়নগিরির নিকুচি করেছে। তার চেয়ে খবরের কাগজ বেচলে কেমন হয়? ব্যাস-কাজের পোষাক পরেই ব্যাটারা খবরের কাগজ বেচতে শুরু করলো।

যে পর্যন্ত তাদের গিয়ে পাকড়াও না করা হতো, তারা হুকারিই করতে থাকতো।

হাইমের ছিলো একটা অদ্ভুত অভ্যাস। রোজ সকালে অফিসে এসে তার প্রথম কাজটি ছিলো পেন্সিল কাটা। হ্যাঁ, বেশ সময় নিয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, বেশ তরিবত করে সে পেন্সিলগুলোকে কেটে সূঁচোলো করতো। ক'টা কল্ কোত্থেকে এলো তা পরে দেখা যাবে—আগে তো পেন্সিল কেটে নিই। এই কাজটা সে করতো খুব পরিপাটি ভাবে, প্রায় ধর্মীয় নিষ্ঠায়। এই পেন্সিল কাটার ব্যাপারে সে পরে আমাকে বলেছিলো—প্রথমেই যদি আমি এই কাজটা সেরে না নিই, সারা দিনের গ্যাঞ্জামে এরকম জরুরী কাজটা আর করাই হবে না।

পেন্সিল কাটবার পর, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আবহাওয়ার অবস্থাটা দেখে নিতো হাইম। তারপর একটা বোর্ডের টুকরোর ওপর সদ্য কাটা পেন্সিল দিয়ে সেদিনকার আবহাওয়া রিপোর্টটা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতো। তার পেন্সিল কাটার মতো, এটাও ছিলো আমার কাছে একটা রহস্যময় ব্যাপার। অবশ্য এর ব্যাখ্যাও সে পরে আমাকে একদিন দিয়েছিলো।

বিভ্রান্তি, অভিযোগ, বদহজম, লোক-স্বল্পতা, ইত্যাকার সমস্যায় আকীর্ন একটি দিন শুরু হতো অন্যদিনের মতোই। যথারীতি আবহ সৃষ্টি করতো চোঁয়াঢেকুর, স্নায়বিক দুর্বলতা, মেনিনজাইটিস, স্বল্প বেতন, ছেঁড়া জুতো, পুরনো পাওনা, শস্য, সোনা আর নগ্নপদ। সেই সঙ্গে—পকেট বই নিখোঁজ, কলম গায়েব, নর্দমায় ভাসমান

টেলিগ্রাম গুচ্ছ, ম্যানেজারের ইঙ্গিতে ভাইস প্রেসিডেন্টের হুমকি্ বৃষ্টি, বিধ্বস্ত খুঁটি, ছেঁড়া তার, কর্মকুশলতার নতুন পদ্ধতি, সুদিনের স্বপ্ন, এবং বোনাসের আবেদন—যা কোনোদিন পাওয়া যাবে না। নতুন ম্যানেজাররা ক্রমাগত উচুঁতে উঠতে উঠতে হঠাৎ কুপোকাৎ হচ্ছিলো। পুরনোরা গর্ত খুঁড়ে প্রবেশ করছিলো আরো গভীরে—যেমন ধাড়ি ইদুঁরেরা ঢোকে পচা পনিরের দলার মধ্যে। তৃপ্ত কেউই ছিলো না। বিশেষ করে জনসাধারণ। কেননা যে তারবার্তা সান ফ্রান্সিসকোতে পৌছতে দশ মিনিট লাগে, তা প্রাপকের হস্তগত হতে এক বছর লাগলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিলো না। এমনও হতো যে, সেই তারবার্তা হয়তো নির্দিষ্ট ঠিকানায় আর কোনোদিনও পেঁাছলো না।

দেশবাসীর নৈতিক চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে ওয়াই. এম. সি এ ছিলো বিনিদ্র। কাজের লোকদের সমাবেশে দুপুর নাগাদ চাকরি সম্পর্কে পাঁচ মিনিটের এক বক্তৃতা দিতেন উইলিয়াম কার্নেগি অ্যাস্টারবিল্ট্ জুনিয়র। কিন্তু আমি ওই বক্তিমে শোনার জন্যে কাউকে পাঠাতাম না। ওয়েলফেয়ার লীগের মিঃ ম্যালোরি সবিনয়ে জানতে চাইতেন, প্যারোলে মুক্তিপ্রাপ্ত জনাকয় বন্দীকে কাজ দেবার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় আমার হবে কিনা তারা যে কোনো কাজ—এমন কি বার্তাবাহকের কাজও সাগ্রহে করতে চায়। ইহুদী দাতব্য সংস্থার মিসেস গগেন হেফার আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকবেন যদি কিছু দুঃখী পরিবারের গৃহ-সংস্কারের জন্যে আমি কিঞ্চিৎ দান করি। কিশোর-আশ্রামের মিঃ হ্যাগার্ট

তো আমার ওপর একরকম নিশ্চিতই ছিলেন যে ক'টা বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলেকে আমি অবশ্যই চাকরি দেবো। নিউ ইয়র্কের মেয়র সাহেব খুবই প্রীত হবেন যদি পত্র বাহককে আমি উপেক্ষা না করি।

তা, খোদ মেয়র সাহেব ওই লোকটিকে তার বিশাল দফ্‌তরে কেন কাজ দেননি—এ ছিলো আমার কাছে এক রহস্য।

আমার সামনে এসে হাজির হতো হয়তো একটা লোক। হাতের চিরকুটটা টেবিলের ওপর রেখে নিশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতো সে। কাগজের টুকরোটায় লেখা: 'আমি অবশ্য সবকিছু বুঝি। কিন্তু আমি কানে শুনিনা!' আর এই শ্রবনশক্তিহীন প্রার্থীটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিই হলো লুথার উইনিফ্রেড। সে তার উলুক-ঝুলুক কোটখানাকে বাগে আনতে চেষ্টা করছে সেফ্‌টিপিন এঁটে। লুথারের নিজের মতে, সে হলো সাত ভাগের দুই ভাগ বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান আর পাঁচ ভাগ জার্মান—আমেরিকান। রেড ইণ্ডিয়ান হিসেবে সে মন্‌টানা থেকে উড়ে আসা কাকদের একজন। এ অফিসে তার শেষ কাজ ছিলো জানালার শার্সি ওঠানো নামানো। কিন্তু ভদ্র মহিলাদের সামনে মই বেয়ে ওঠা ব্যাপারটা তার কাছে ছিলো লজ্জাকর। শিগগীরই সে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সেখান থেকে এই তো এসেছে। দেহটা অবশ্য এখনো দুর্বল, তবে হ্যাঁ টেলিগ্রামের গোছা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাবার কাজটা দিব্যি পারবে।

ফার্দিনান্দ মিশোর কথাই বা কি করে ভুলি। সে সারাটা

সকাল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। বেচারার একটা চিঠির ও জবাব দেয়া হয়নি। মনে আছে, তার শেষ চিঠিটা এসেছিলো এক পশু-হাসপাতাল থেকে। একটা কুকুর-বিড়ালের হাসপাতাল। সেখানেই তখন সে কাজ করতো। কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে চাকরিটা! আমি কারণ জিজ্ঞেস করতে সে জানালো —তার বাপের অত্যাচারেই তাকে এটা করতে হয়েছে। লোকটা এমন নির্দয় যে, এতো বড়ো ছেলেটাকে বাইরে বেরুতে দিতো না। রাত্রে পাশে নিয়ে শুতো। মিশ্ সখেদে জানায়, এখন আমার বয়েস পঁচিশ। এই বয়েসে অমন খোকাপনা মানায়, বলুন? আমি আর বাপের হোটেলে খেতে চাই না। আমি স্বনির্ভর হতে চাই। তাইতো বেরিয়ে পড়েছি বাড়ি থেকে। আমার ইচ্ছে—

মিশ্ এই বাসারই এক পুরনো পাখি। ওর ফিটের ব্যামো আছে। নানা কারণে অফিসের অনেকের বিশেষ করে ম্যাক গভার্ণ আর আমার স্নেহাস্পদ ছিলো। তাকে বললাম—'পাশের ঘরে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে নাও।' মিশ যখন ড্রেসিংরুমে, তখন এক এতিম বলছে, 'সে যদি একটা সুযোগ পায় তাহলে কোম্পানিকে সাফল্যের দুয়ারে পেঁছে দেবে।' কেবল তাই নয়। কাজ পেলে সে ফি-রোববার চার্চে গিয়ে আমার জন্যে প্রার্থনা করবে। রোববারেই সে পারবে, কেননা অন্যান্য দিন তাকে হাজিরা দিতে হয় প্যারোল অফিসে। কি জন্যে সে ফ্যাক খাটছে? না সে তেমন কিছু করেনি। একটা লোককে ধাক্কা দিয়েছিলো, লোকটা মাথা ফেটে মরে গেছে।

এতিমের পর এলেন জিব্রাল্‌টার-ফেরৎ এক প্রাক্তন-কন্সাল। দুর্দান্ত হাতের লেখা। তাঁকে আমার সঙ্গেএকান্তে দেখা করতে বলে সেদিনকার মতো ক্ষান্ত দিলাম। হঠাৎ একটা হৈ চৈ উঠলো পাশের ঘরে। কি ব্যাপার? না ফার্দিনান্দ মিশ্‌ 'একটু' অজ্ঞান হয়েছে। তা হবেই। ফিটের রোগী তো। ভাগ্যিস রাস্তায় গিয়ে ফিট হয়নি। আমার তো মুখ রক্ষা করাই কঠিন হতো তাহলে।

আর একটা হট্টগোল। কি? না তেমন কিছু নয়। একটা লোক ঢুকতে চেয়েছিলো আমারই অফিসে। ম্যাক গভার্ণ তাকে দরোজা দেখিয়ে দেয়ায় সে ক্ষেপে গেছে। সে গর্জন করে বলছিলো— 'হাত একটা নেই, তাতে হয়েছেটা কি! আরে মিয়া আমার তাগদ আছে। শরীলটা দেখেও কি বোঝা যায় না?' 'এবং তার বক্তব্য যে সঠিক তা প্রমান করার জন্যে সে একটা চেয়ার শূন্যে তুলে আছড়ে ভাঙ্গলো মেঝের ওপর। আমি ডেস্কে ফিরে গেলাম। সেখানে আমার জন্যে একটা টেলিগ্রাম পড়ে আছে। আমি খুললাম। দক্ষিণ-পশ্চিম অফিসের ২৪৫৯ নম্বর সাবেক মেসেন্‌জার জর্জ ব্লাসিনি। 'এতো তাড়াতাড়ি কাজটা ছেড়ে দিতে হলো বলে দুঃখিত। আমি কাজ ভালোবাসি। তবে চরিত্রের আলস্যের কারণে মানুষকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে হয়।' —জঘন্য!

প্রথম প্রথম আমি ছিলাম অন্য রকম। তখন প্রতি দশদিন অন্তর সবাইকে নিয়ে বৈঠকে বসতাম। বলতাম, তোমরা কলজেটাকে বড়ো করো। আমার পকেটে টাকা থাকতো না। আমি অন্য-

দের টাকা ইচ্ছে মতো খরচ করতাম। বস্ হিসেবে এটা ছিলো আমার এখতিয়ারভুক্ত। আমি একে ওকে তাকে টাকা দিয়েছি। বিলিয়ে দিয়েছি আমার জামা প্যান্ট বই পত্র। মোটকথা, বাড়তি কিছু থাকলেই আমি তা বিলিয়ে দিয়েছি। যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, তাহলে পুরো কোম্পানিটাই ফকিন্নির বাচ্চাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম। আমার কাছে কেউ এক ডলার চাইলে তাকে ভিক্ষে দিতাম পাঁচ ডলার। কতো দিয়েছি সে হিসেবের ধার আমি ধারিনা। কেননা ধার করা এবং গরীব শয়তানদের তা ফেরৎ না দেয়া দুটোই ছিলো আমার কাছে সহজ।

মানুষ সর্বত্রই গরীব। তারা সব সময়ই 'হতো' এবং 'হবে'-র ছকে বন্দী। আর এই ভয়াবহ দারিদ্রের নিচে জ্বলছে একটা শিখা। কিন্তু স্বভাবতই তা এতো নিচু যে প্রায় চোখেই পড়ে না। কেউ যদি সেই শিখার ওপর সাহস করে একবার মুষ্ঠাঘাত করে তাহলেই ঘটে যায় প্রলয়ঙ্কারী অগ্নিকাণ্ড। কতোজন আমাকে উপদেশ খয়রাত করতো! বলতো, আবেগ এবং দানশীলতা পরিহার করো। ধীর হও, কঠিন হও। তারা এইসব বলে আমাকে হুঁশিয়ার করতো। কিন্তু আমি নিজেকে বলতাম—গুল্লি মারো! আমি ওইসব ছেঁদো কথার ধার ধারিনা। বরং আমাকে হতে হবে দানশীল, সহিষ্ণু এবং ক্ষমা সুলভ দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারী। আগে আমি প্রতিটি প্রার্থীরই বক্তব্য শুনতাম শেষ পর্যন্ত। যে ক'জনকে পারতাম চাকরি দিতাম। যাদের চাকরি দিতে না-পারতাম, তাদের টাকা দিতাম। যখন পকেটে টাকা না থাকতো তখন সিগারেট দিতাম। কিংবা দিতাম সাহস।

কিন্তু আমি দিতাম। আর এর ফল হতো দুর্দান্ত। ভালো ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ন ভাষার ফলাফল মাপা যায় না। আদর-সমাদর, শুভেচ্ছা-সৌহার্দ উপহার আর আমন্ত্রনে প্লাবিত হয়ে যেতাম আমি।

যদি পারতাম! যদি আমার হাতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকতো, যদি গাড়ির পঞ্চম চাকাটি আমি না হতাম, তাহলে উত্তর আমেরিকার কসমোডে-মোনিক টেলিগ্রাম কোম্পানিটাকেই বানাতাম মানবিকতার ঘাঁটি। দূর করতাম উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যেকার বৈষম্য। এমনকি কানাডা ডোমিনিয়ণের যাবতীয় অপূর্ণতার দিকেও আমি মনোযোগ দিতাম। আমার হাতে সেই মন্ত্রগুপ্তিটা ছিলো। মানুষের প্রতি দয়া, সহানুভূতি ও সমমর্মিতা—এই ছিলো আমার শক্তি।

আমি একাই পাঁচ জনের কাজ করতাম। খুব বেশী হলে আমি তিন বছর ঘুমিয়েছি। আমার প্রতিটি শার্টই ছিলো ছেড়াঁ। আমি স্ত্রীর কাছ থেকে ধার নিতাম। অফিসে যাবার গাড়ি ভাড়া না থাকলে বাচ্চার ব্যাংক ভাঙ্গতাম। আমি সাবওয়ে স্টেশনের অন্ধ সংবাদপত্র হকারকেও প্রতারণা করতাম। আমার চারদিকে এতো ধার জমে-ছিলো যে বিশ বছর চাকরি করেও তা শোধ করতে পারতাম না। অবশ্য আমি তাদের কাছ থেকেই নিতাম, যাদের ছিলো। এবং দিতাম তাদেরকেই, যাদের খুব দরকার।

চাকরিতে আমার প্রথম দিনগুলোর অন্যতম উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হচ্ছে মহিলা মেসেনজারদের ব্যাপারটা। এরা পুরো পরিবেশটাকেই পাল্টে দিতো। বিশেষ করে হাইমের জন্যে এরা ছিলো যেন ঈশর-

প্রেরিত। এরা আমার সামনে এসে ভীড় জমালে হাইম তার সুইচ বোর্ডের পেছন ফিরে, এদিকে তাকিয়েই কাজ করতো। তার সারা মুখে হাসি লেগেই থাকতো। যেন সে স্বর্গে বসে আছে। দিনের শেষে আমার তালিকায় থাকতো পাঁচটা অথবা ছ'টা মেয়ের নাম, যারা সাংঘাতিকভাবে লেগে আছে। খেলাটা ছিলো তাদেরকে সুতোয় বেঁধে নাচানো। তাদের চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো ঠিকই—তবে এক শর্তে। তা হলো, বিনে পয়সায় একবার আমাদের সঙ্গে শুতে হবে। তবে খরচ একটা হতোই। তা হলো রাত্রে অফিসের ড্রেসিংরুমের ধাতব টেবিলের ওপর শোয়াবার আগে তাদের কিছু একটা খেতে দিতে হতো। যেসব মেয়েদের আরাম দায়ক অ্যাপার্টমেন্ট থাকতো—এবং অনেকেরই তা ছিলো—আমরা তাদের বাসায়ই যেতাম এবং বিছানাতেই কাজ সারতাম। যদি তারা মদ খেতে চাইতো, হাইম গিয়ে বোতল নিয়ে আসতো। যদি তাদের কারো ময়দার লেচির দরকার হতো, ব্যাগ থেকে ভেল্কি বাজির মতোই তা বের করে দিতো হাইম। চমৎকার ওই ভেজা ময়দার তালগুলো দেখে জিহ্বায় পানি এসে যেতো আমার। আমি ভেবে পেতাম না—লোকটা ওগুলো আনে কোত্থেকে। কেননা আমাদের মধ্যে ওর বেতনই ছিলো সবচেয়ে কম। যাই হোক এগুলো থাকতো। এবং মদ ময়দার লেচি কোত্থেকে আসে তা কখনো ওকে জিজ্ঞেস করিনি আমি। করার দরকার বোধ করিনি।

একবার ঘটলো এক অসাধারণ ঘটনা। আমি বোনাস পেয়েছিলাম। পেয়েই হাইমের পুরো ধার শুধিয়ে দিলাম আমি। পাই পর্যন্ত।

ব্যাপারটা হাইমকে এতোই খুশি করে যে সেই রাতেই সে আমাকে নিয়ে ডেলমোনিকোতে খেতে যায়। কেবল তাই নয়। পরদিন সে আমাকে কিনে দেয় শার্ট, হ্যাট আর দস্তানা। সে এতো বেশী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলো যে, নির্বিকার প্রস্তাব দিয়ে বসলো, ইচ্ছে করলে আমি তার বাড়িতে গিয়ে তার বউকে লাগাতে পারি। যদিও হাইম আমাকে সচেতন করে দিলো এই বলে যে, তার স্ত্রীর ডিম্বকোষে ইদানীং খানিকটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। বলা দরকার বউয়ের ডিম্বকোষের অসুস্থতার কথা যত্রতত্র বলা হাইমের বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

হাইম আর ম্যাকগভার্ণের সঙ্গে আমার আরো দু'জন স্বর্ণকুন্তলা সহকারিনী ছিলো। তারা কোনো কোনদিন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে ডিনারও খেতো। এদের একজন হলো ও' মারা। সে সদ্য ফিরে এসেছে ফিলাডেলফিয়া থেকে। এখন সে আমার প্রধান সহকারী। নাকি সহকারিনী? ও' মারা অবশ্য আমার পুরনো বন্ধু। আরো ছিলো ধর্মের ষাঁড় স্টিভ রোমেরো, যাকে আমি বিপদ আপদে পাশে রাখতাম। কোম্পানীর গোয়েন্দা ও' রুরকি দিনের শুরুতেই তার রিপোর্ট পেশ করতো আমার কাছে। আমি আরো একজন তরুণকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। মেডিক্যালের ছাত্র—নাম ক্রনস্কি। আমরা ছিলাম এক গোয়ালের গরু—কেবল ক্রনস্কি ছাড়া। ছেলেটা ডিগ্‌নিটি-মেনটেন করতো। তাছাড়া ব্যাটার অণ্ডকোষে গোলমাল ছিলো। ফলে মাগিবাজীতে সে হারিয়ে ফেলেছিলো উৎসাহ। তবে হ্যাঁ, ও' রুরকির মতো মানুষ হয়না। সে ছিলো এক দয়ালু রাজপুত্র। বিপদে আমরা সবাই তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

প্রেরিত। এরা আমার সামনে এসে ভীড় জমালে হাইম তার সুইচ বোর্ডের পেছন ফিরে, এদিকে তাকিয়েই কাজ করতো। তার সারা মুখে হাসি লেগেই থাকতো। যেন সে স্বর্গে বসে আছে। দিনের শেষে আমার তালিকায় থাকতো পাঁচটা অথবা ছ'টা মেয়ের নাম, যারা সাংঘাতিকভাবে লেগে আছে। খেলাটা ছিলো তাদেরকে সুতোয় বেঁধে নাচানো। তাদের চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো ঠিকই—তবে এক শর্তে। তা হলো, বিনে পয়সায় একবার আমাদের সঙ্গে শুতে হবে। তবে খরচ একটা হতোই। তা হলো রাত্রে অফিসের ড্রেসিংরুমের ধাতব টেবিলের ওপর শোয়াবার আগে তাদের কিছু একটা খেতে দিতে হতো। যেসব মেয়েদের আরাম দায়ক অ্যাপার্টমেন্ট থাকতো—এবং অনেকেরই তা ছিলো—আমরা তাদের বাসায়ই যেতাম এবং বিছানাতেই কাজ সারতাম। যদি তারা মদ খেতে চাইতো, হাইম গিয়ে বোতল নিয়ে আসতো। যদি তাদের কারো ময়দার লেচির দরকার হতো, ব্যাগ থেকে ভেল্কি বাজির মতোই তা বের করে দিতো হাইম। চমৎকার ওই ভেজা ময়দার তালগুলো দেখে জিহ্বায় পানি এসে যেতো আমার। আমি ভেবে পেতাম না—লোকটা ওগুলো আনে কোত্থেকে। কেননা আমাদের মধ্যে ওর বেতনই ছিলো সবচেয়ে কম। যাই হোক এগুলো থাকতো। এবং মদ ময়দার লেচি কোত্থেকে আসে তা কখনো ওকে জিজ্ঞেস করিনি আমি। করার দরকার বোধ করিনি।

একবার ঘটলো এক অসাধারণ ঘটনা। আমি বোনাস পেয়েছিলাম। পেয়েই হাইমের পুরো ধার শুধিয়ে দিলাম আমি। পাই পর্যন্ত।

ব্যাপারটা হাইমকে এতোই খুশি করে যে সেই রাতেই সে আমাকে নিয়ে ডেলমোনিকোতে খেতে যায়। কেবল তাই নয়। পরদিন সে আমাকে কিনে দেয় শার্ট, হ্যাট আর দস্তানা। সে এতো বেশী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলো যে, নির্বিকার প্রস্তাব দিয়ে বসলো, ইচ্ছে করলে আমি তার বাড়িতে গিয়ে তার বউকে লাগাতে পারি। যদিও হাইম আমাকে সচেতন করে দিলো এই বলে যে, তার স্ত্রীর ডিম্বকোষে ইদানীং খানিকটা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। বলা দরকার বউয়ের ডিম্বকোষের অসুস্থতার কথা যত্রতত্র বলা হাইমের বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

হাইম আর ম্যাকগভার্ণের সঙ্গে আমার আরো দু'জন স্বর্ণকুন্তলা সহকারিনী ছিলো। তারা কোনো কোনদিন সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে ডিনারও খেতো। এদের একজন হলো ও' মারা। সে সদ্য ফিরে এসেছে ফিলাডেলফিয়া থেকে। এখন সে আমার প্রধান সহকারী। নাকি সহকারিনী? ও' মারা অবশ্য আমার পুরনো বন্ধু। আরো ছিলো ধর্মের ষাঁড় স্টিভ রোমেরো, যাকে আমি বিপদ আপদে পাশে রাখতাম। কোম্পানীর গোয়েন্দা ও' রুরকি দিনের শুরুতেই তার রিপোর্ট পেশ করতো আমার কাছে। আমি আরো একজন তরুণকে সঙ্গে নিয়েছিলাম। মেডিক্যালের ছাত্র—নাম ক্রনস্কি। আমরা ছিলাম এক গোয়ালের গরু—কেবল ক্রনস্কি ছাড়া। ছেলেটা ডিগ্রি নিটি-মেনটেন করতো। তাছাড়া ব্যাটার অণ্ডকোষে গোলমাল ছিলো। ফলে মাগিবাজীতে সে হারিয়ে ফেলেছিলো উৎসাহ। তবে হ্যাঁ, ও' রুরকির মতো মানুষ হয়না। সে ছিলো এক দয়ালু রাজপুত্র। বিপদে আমরা সবাই তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।

তিন

এই ভাবে সানসেট প্লেসে কেটে গেলো কয়েকটি বছর। এই সময়ের মধ্যে আমি মানবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হলাম। সমৃদ্ধ হলাম নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায়। একান্ত মুহূর্তে আমি সেই সব অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে লিখে রাখতাম। আমার ইচ্ছে ছিলো পরবর্তী সময়ে এগুলোকে আমি কাজে লাগাবো। আমি কেবল খুঁজে মরছিলাম প্রয়োজনীয় অবকাশ।

হঠাৎ একদিন অফিস-মিটিংয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার বক্তৃতায় বললেন, তিনি চান কেউ একজন মেসেনজারদের নিয়ে হোরেশিও অ্যালগার বুক' ধরনের একটা কিছু লিখুক। তিনি আমাকে ইঙ্গিত করেই যে কথাটা বললেন, তাতে আর সন্দেহ কি? তাঁর ইঙ্গিতে আমি মনে মনে ক্ষেপে গেলাম। শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, ঠিক আছে; আমি লিখবো। বুকের ভিতরে আমার যে অভিজ্ঞতা পুঞ্জীভূত হয়েছে, তা বের করে দিয়ে খানিকটা হালকা হওয়া দরকার। মনে মনে আমি আওড়ালাম, লিখবো রে লিখবো! পিয়নদের পাঁচালি আমি ভালো করেই লিখবো। কেবল একটু খানি সবুর কর। ভাইস প্রেসিডেন্ট অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথার মধ্যে যেন তাণ্ডব চলছিলো। দিব্য চোখে যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আমার পাশ দিয়ে নর নারী

আর শিশুদের মিছিল চলেছে। সবাই ক্রন্দনরত। তারা ভিক্ষে করছে। থুথু ফেলছে। ধমকাচ্ছে। বড়ো রাস্তায় তারা যে পদ-চিহ্ন রেখে যাচ্ছে তা আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার।

দেখছি মাল গাড়ি পড়ে আছে মেঝের ওপর। মা বাবারা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। কয়লার ঝুড়ি খালি। ঠাণ্ডা দেয়ালের ওপর দিয়ে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে আরশোলারা। লোহার পাতে মোড়া দর্শন সঙ্গে নিয়ে মানুষ অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে। তাদের মুখে মোটা চুরুট। তারা বলছে, এ অবলাবস্থা সাময়িক। শিগগীরই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। হোরেশিও অ্যালগার নায়ককে আমি দেখতে পাচ্ছি। একজন অসুস্থ আমেরিকানের স্বপ্ন। সে একটার পর একটা মেসেঞ্জারকে শূন্যে টাঙিয়ে রাখছে। প্রথমে বার্তাবহ, তারপর অপারেটার, তারপর ম্যানেজার, তারপর চীফ, তারপর সুপারেন্টেনডেন্ট, তারপর ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারপর ট্রাষ্ট ম্যাগনেট, বীয়ার ব্যারণ, তারপরে নিখিল আমেরিকার প্রভু, টাকার ঈশ্বর, ঈশ্বরদের ঈশ্বর, কাদার কাদা, শূন্যের শূন্যতা। সাতানব্বুই হাজার দশমিক চার এবং তারপরে শূন্য। ব্যাটা গর্দভ—আমি নিজেকে বললাম—আমি মনে মনে বললাম, আমি তোমাকে বারোটি ছোট্ট মানুষের ছবি দেবো। দেবো দশমিকহীন একগুচ্ছ শূন্য। দেবো ও ডিজিটে ঘূর্ণ্যমান বারোটি মৃতুহীন কীটের নোংরা মালা!

পৃথিবীর সব দেশ থেকেই আমার কাছে এসেছে ওরা। কেবল ক্ষীণ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা আদিম মানুষদের কোনো প্রতিনিধিত্ব

নেই এ মিছিলে। আসেনি আইনু, মাওরী, পাপুয়ান, বৈদ্য, ল্যাপ জুলু, প্যাটাগোনীয় ইগ্রোটাও, হটেনটোট আর তোয়াবেগ। আসেনি বিলীন তাসমেনীয়রা। লুপ্ত গ্রীম্যাল্ডি বা অ্যাটল্যান্টিসীয় মানুষেরা। তবে সারা দুনিয়ার একটা ছোটখাটো সংস্করণ যেন এই অফিসটা। এখানে এমন দুটি ভাই আছে আমার যারা এখনো সূর্যোপাসক। প্রাচীন অসিরীয়-পৃথিবীর দুই নেস্তোরীয়, মাল্টা থেকে আসা দুই মাল্টিজ—যমজ। এবং ইয়ুকাটানের দুই মায়া। আমাদের ছিলো ফিলিপিন্‌স থেকে আসা কিছু ছোট্ট বাদামী ভাই, আবিসিনিয়া থেকে কিছু ইথিওপীয়।

তাছাড়া ছিলো আর্জেন্টিনার ভবঘুরে, মনটানার কাউ-বয়। ছিলো গ্রীক, লেট, পোল, ক্রোটস, শ্লভেন, রুদেনীয়, চেক, স্প্যানিয়ার্ড, ওয়েলস্‌ম্যান, ফিন, সুইডিশ, রুশ, দিনেমার, মেক্সিকান, পোর্টোরিকান, কিউবান, উরুগুয়ান, ব্রেজিলীয় অস্ট্রেলীয়, পারসিক, জাপানী, চীনা, জাভানীজ, মিশরীয়, আফ্রিকান, তুর্ক, আরব, জার্মান, আইরিশ, ইংরেজ, কানাডীয়—প্রচুর ভারতীয় আর প্রচুর ইহুদী। একজন মাত্র ফরাসী এখানে ছিলো, তবে আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে মোটে তিন ঘণ্টা এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছিলো। কিছু রেড ইণ্ডিয়ানও এখানে কাজ করতো; যাদের বেশির ভাগই চেরোকী সম্প্রদায়ের। কিন্তু ছিলো না কোনো তিব্বতী বা এস্কিমো।

আমি দেখতাম, কাজ চাইছেন মিশর তত্ত্ববিদ, উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ, সার্জন, খনি-বিশেষজ্ঞ, প্রাচ্য ভাষার অধ্যাপক, সঙ্গীতকার

ইঞ্জিনীয়ার, চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ নৃতত্ত্ববিদ, রসায়নবিদ, গণিতজ্ঞ, মহানগরীর মেয়র, রাজ্য-গভর্ণর, নাবিক, দন্ত-চিকিৎসক, চিত্রকর, ভাস্কর, মিস্ত্রী, স্থপতি, ডুবুরি, চাষী, ঘড়ি ও পোষাক বিক্রেতা, বাতিঘর-রক্ষক, লম্পট, অল্ডারম্যান, সিনেটর,—এক কথায় সূর্যের নিচের সমস্ত পেশার বেকার মানুষ। সবাই কাজ চান। চান সিগারেট গাড়ি ঘোড়া আর একটা সুযোগ। কিছু সৎ লোক যখন আন্তরিক ভাবে চান—ঈশ্বর হয়তো তাকে একটা সুযোগ দেন। তবে ওই 'কসমোকক্কাস' টেলিগ্রাফ কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট? কদাচ নয়। অফিসে আমার কাজের টেবলে বসেই যেন একসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীটাকে আমি দেখতে পেতাম। সর্বত্র নেই নেই রব—দাও দাও চীৎকার! সব খানেই অভাব আর ক্ষুধা। অন্ধকার অত্যাচার আর অমানবিকতা।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের রাস্তায় এরা কারা হাঁটছে? হায়, এদেরই কারো হাতে হয়তো ভার পড়েছে পৃথিবী শাসনের। ভার পড়েছে দুনিয়ার সেরা গ্রন্থটি রচনার। আমার মনে পড়ে কিছু পরিচিত পারসিক, হিন্দু এবং আরবের কথা। তাদের চরিত্রের মহত্ব ও পবিত্রতা আমাকে বিস্মিত করে। শ্বেতাঙ্গ দিগ্বিজয়ীদের মুখে আমি থুথু দিই। বেপথু বৃটিশ, শুয়োর মুখো জার্মান আর আত্মপ্রসাদ পুষ্ট ফরাসীদের আমি ঘেন্না করি। পৃথিবীটা কাদের বাসভূমি? সাদাদের? কালোদের? হলুদদের? নাকি হারিয়ে যাওয়া নীল মানুষদের? আসলে পৃথিবী কারো একক বাসভূমি নয়—সব মানুষের। ঈশ্বরের কাছে সবাই সমান এবং প্রত্যেকেরই সুযোগ

পাওয়া উচিত। সে সুযোগ যদি এখন না আসে—কবে আর আসবে! কস্মিন কালেও না—কোটি কোটি বছর পরও না।—কী? না আমেরিকান! ইস্-আমেরিকান! উচ্চারনের সঙ্গে যেন মুখ দিয়ে মধু ঘরে পড়ে। কিন্তু 'আমেরিকান'—এই ছাপমারা সবকিছুই একদিন উচ্ছন্নে যাবে। গ্রীস, রোম বা মিশরীয় সভ্যতা যেভাবে ধ্বংস হয়েছে তার চেয়ে ভয়াবহ ভাবে গোল্লায় যাবে মার্কিন মুলুক। চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না!

ভ্যালেসকাকে নিয়ে মুশকিল ছিলো এই যে তার ধমনীতে ছিলো নিগ্রো রক্ত। তাকে নিয়ে আমার ঘুরপাক খাওয়া দেখে চোখ টাটাতো অনেকরই। অনেকেই ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারতো না। ভ্যালেসকার মা-টার ছিলো সাদা চামড়াই। বাপ যে কে ছিলো, তা কে বলবে। ভ্যালেসকা নিজেও কি তা জানে? না তা জানা সম্ভব। যাহোক, ওকে নিয়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছিলাম মন্দ নয়। কিন্তু খবরটা ফাঁস হয়ে গেলো একদিন। ভাইস প্রেসিডেন্টের লেলিয়ে দেয়া এক ইহুদি স্পাই ঘাবড়ে গিয়ে ব্যপারটা আমাকে জানালো চুপে চুপে। আমি জেনে শুনে একটা কালো সেক্রেটারী নিয়োগ করেছি, এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আর তাই নিয়েই ওর দুর্ভাবনা।

পরদিন ভাইস প্রেসিডেন্টের খাস কামরায় জরুরী বৈঠক। আমি জানলাম, ভ্যালেসকার জাতপাত নয়—ওর বুদ্ধিমত্তাই আমাকে আকৃষ্ট করেছে। সে কাজ বোঝে এবং প্রচণ্ড খাটিয়ে মেয়ে। শেষে খোদ্ প্রেসিডেন্টের দুয়ার অব্দি গড়ালো বলটা। তিনি ভ্যালেস্কার সঙ্গে

কথা বললেন। তারপর অফিসকে জানালেন, ওকে আরো একটু উঁচু পদ-মর্যাদায় হাভানায় বদলি করে দাও। ভ্যালেসকা রাগে কাঁপতে কাঁপতে অফিসে এলো। রাগলে ওকে যা দারুন লাগতো না।

ভ্যালেসকা, রোমেরো, হাইম আর আমি সেদিন একত্রে ডিনারে গেলাম। ফেরার পথে ভ্যালেসকা বললো—সে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে। আমাকে নিয়েও দুশ্চিন্তা তার কম নয়। আমার কোনো বিপদ হবে না তো? আমি তাকে অভয় দিলাম, তার চাকরি চলে গেলেও আমার কিছুই হবে না। মনে হলো, কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। তখন আমি বললাম, যা হয় হবে—আমি পরোয়া করি না। তখন ভ্যালেসকা দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মুখের দিকে তাকালো। ওর দুচোখে টলটল করছে পানি। গালের ওপর গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা।

সেই তো হলো শুরু। তাকে লিখলাম, তোমার জন্য আমি বড্ড কাতর আছি। কিন্তু চিঠি পড়ে সে জানালো, একথা তার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সে রাত্রে আমরা এক সঙ্গে ডিনার খেলাম এবং প্রচুর পান করে নাচতে গেলাম। নাচের সময় লক্ষ্য করলাম, ও আমাকে বিশেষভাবে চেপে ধরেছে। সময়টা ছিলো আমার জন্যে ভয়াবহ। কেননা আর একটি গর্ভপাতের জন্যে আমার বউ তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

নাচবার সময় এই কথাটা আমি ভ্যালেসকাকে বললাম। নাচের আসর থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ সে বললো—তোমার বাড়িতে

এমন বিপদ। আমার কাছ থেকে একশো ডলার ধার নাও না কেন? পরের দিন রাতে ভ্যালেসকাকে আমার বাসায় ডিনার খেতে নিয়ে গেলাম। ও নিজেই আমার বউয়ের হাতে তুলে দিলো একশো ডলার। দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। ঠিক হলো, গর্ভপাতের দিন ভ্যালেসকা আমার বাড়িতে আসবে এবং আমার স্ত্রী হাসপাতালে গেলে বাচ্চাটার দেখাশোনা করবে। নির্দিষ্ট দিনে আমি দুপুরের আগেই ছুটি দিয়ে দিলাম ভ্যালেসকাকে। তাকে ছুটি দেবার এক ঘণ্টা পরে আমিও বেড়িয়ে পড়লাম অফিস থেকে। ভাবছিলাম হাসপাতালে যাবো কি না। হাসপাতালের দিকে খানিকটা এগিয়েও গেলাম আমি। কিন্তু মুহূর্তে মত বদলে এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরে এক সময় বাড়িমুখো হলাম।

বাচ্চাটা খুব ঝামেলা করছিলো। ভ্যালেসকা আর আমি অনেক কষ্টে ওকে ঘুম পাড়ালাম। সে যখন পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিলো—ভ্যালেসকা আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। চুমুও বটে। মনে হচ্ছিলো, তার জিহ্বাটা আমার গলার ভেতরে ঢুকে গেছে। আমার হাত চলে গেলো তার দুপায়ের মাঝামাঝি জায়গায়। আমি যখন টেবিলের ওপর তাকে চিৎ করে শোয়ালাম, সে আমার শরীরের দু'দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেলো দাদার কথা। দাদা কাজের বেঞ্চে বসে আছেন। মাকে লক্ষ্য করে বলছেন—তোর পুঁচকে ছেলেটা এত বেশি বই নিয়ে থাকে কেনরে? কথা বলতে বলতে তিনি গরম ইস্ত্রিটা

চেপে ধরেছেন কোটের কলারের ওপর। আর একদিন। ঠিক হয়েছে আমরা যাবো জাহাজ ঘাটা দেখতে। অন্তত আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সেই আশাতেই। কিন্তু বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারখানা থেকে ফেরার পথে অনুভব করলাম, আমার টনসিল আর নেই। আর সেই সঙ্গে বিশ্বাসও নেই মানুষের ওপর।

কিন্তু আমাদের খুব চটজল্‌দি সারতে হলো—কেননা দরজায় ঘণ্টা বাজছে। বউটা নিশ্চয় ফিরে এলো কসাইখানা থেকে। আমি ভ্যালেসকার ওপর থেকে উঠে—ফ্লাইয়ের বোতাম লাগাতে লাগাতে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলে দিলাম। বউয়ের মুখটা রক্তহীন, সাদা। মনে হচ্ছিলো আর এক পা-ও সে হাঁটতে পারবে না। ভ্যালেসকা আর আমি এক রকম ধরাধরি করে নিয়েই ওকে শুইয়ে দিলাম বিছানায়।

সেদিন হাভাতের মতো ঘুরছিলাম একটা শিকারের আশায়। ক্ষুন্নমনে বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ এক বন্ধুর বোনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে তার সঙ্গে ডিনার খেতে বাধ্য করলো। ডিনারের পর আমরা ঢুকলাম সিনেমা হলে। প্রেক্ষাগৃহের আধো অন্ধকারে আমরা ছবি যতোটা দেখছিলাম তার চেয়ে বেশি হাতড়াচ্ছিলাম পরস্পরের শরীর। শেষে উভয়ই এমন একটা পর্যায় এসে পৌঁছলাম যে হলের মধ্যে বসে থাকার মতো ধৈর্যটুকুও আর রইলো না। হল থেকে বেরিয়ে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমার অফিসে। তারপর মেয়েটিকে শোয়ালাম আমার পুরোনো বন্ধু সেই জিঙ্ক-

টেবিলটার ওপর।

মাঝরাতের একটু পরে সবেমাত্র বাড়ি ফিরেছি—হঠাৎ ভ্যালেসকার ফোন। আমাকে নাকি এক্ষুনি তার দরকার। সাংঘাতিক একটা জরুরী কথা নাকি আছে। কি আর করা! তক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হলো। এক ঘণ্টার দীর্ঘ রাস্তায় গাড়ির ভেতরে বসে নানা দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হচ্ছিলাম আমি। কি বলবে ভ্যালেসকা। এরকম অসময়ে আমার কাছে কী তার এমন জরুরী কথা! ওর বাসায় ফিরে দেখি, এক সুন্দরী যুবতী চিন্তিত মুখে বসে আছে বিছানার ওপর। ভ্যালেসকার চাচাতো বোন। হতভাগী নাকি প্রেমে পড়েছিলো এক অদ্ভুত মানুষের। হাজার চেষ্টা করেও কুমারীত্ব রক্ষা করতে পারেনি সে। কারবার চালিয়ে গেছে অবিরাম। কিন্তু গ্যাঞ্জামের কোনো প্রতিষেধক নেয়নি। ফলে অবস্থা কেরোসিন! পেটের মধ্যে মানুষের ছা—যথা ইচ্ছা তথা যা! এখন উপায়? ভ্যালেসকার মুখ থম থম প্রাণ থর থর। আমার কাছে সে জানতে চাইলো, এখন কি করা দরকার—কোথায় যাওয়া উচিত!

আমি নিবেদন করলাম, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারনাই নেই। ভ্যালেসকা কিংবা তার বোন কতোটা হতাশ হয়েছে আমি তা আঁচ করতে পারলাম না। নানা আবোল তাবোল প্যাচালের পর ভ্যালেসকা তার চাচাতো বোনের দিকে ইঙ্গিত করে বললো—ওর ব্যাপারে এখন আর কোনো নিষেধাজ্ঞা অবশ্য নেই, তবে কি জানো, এ অবস্থায় বোধহয় নতুন কিছু না-করাই ভালো।

আমরা সেই দুপুর রাতে পাগলের মতো হাসাহাসি করলাম। আড্ডা

দিলাম অনেকক্ষণ। মদ খেলাম। সারা বাড়িতে এক "কুমেল" ছাড়া আর কোনো মাল ছিলো না। ফলে চুর হবার মতো অবস্থা হলো না কারুরই। তারা দু'জনেই আমার ওপর থাবা চালাতে লাগলো এবং কেউই আমাকে নিয়ে কাউকে কিছু করতে দিলো না সারা রাত। ফল হলো এই যে, আমি দু'জনকেই ন্যাংটো করে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম। তারা জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে পড়লো। আর আমি আস্তে আস্তে বেড়িয়ে এলাম বাইরে। ভোর হয়ে গেছে। পাঁচটা বাজে। পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম আমি। আমার পকেটে একটা পাই পয়সাও নেই। ট্যাক্সি ভারা কোত্থেকে আসবে এখন? সামান্য পয়সার জন্যে শেষে ফার-লাইনড ওভার কোটটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে দিয়ে বৈতরনী পার হলাম।

বাড়ি ফিরতেই তেড়ে এলো বউ। সারাটা রাত এমন বাইরে কাবাড় করে এলে তেড়ে আসবেই না বা কেন? ঝগড়া তুঙ্গে উঠলো শিগ-গীরই। এক সময় রাগে অগ্নি শর্মা হয়ে আমি তাকে এমন একটা ধাক্কা মারলাম যে, সে মেঝেয় পড়ে চীৎকার করে উঠলো। তার সারা শরীর কাঁপছে। মায়ের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেছে বাচ্চাটার। সে ব্যাপার কি তা জানার জন্যে দৌড়ে এলো এই ঘরে। মায়ের অবস্থা দেখে এমন জোরে কেঁদে উঠলো যে, মনে হলো ওর ফুস-ফুসটা ফেটে যাবে। ওপর তলার মেয়েটা পর্যন্ত দৌড়ে এলো ব্যাপার কি তা দেখবার জন্যে। তার পরণে ছিলো কিমোনো। চুলগুলো পড়ে আছে পাছার উপর। উত্তেজনাবশত সে আমার এতোটা কাছে ঘেঁসে এসেছিলো যে তার ফলে আমাদের মধ্য যা ঘটলো তার ওপর

আমাদের কারো হাত ছিলোনা।

আমরা দুজন আমার স্ত্রীকে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটা ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো তার মাথায়। এবং দোতালার মেয়েটি যখন তার উপর ঝুঁকে আছে—আমি পেছন থেকে তার কিমোনোটা তুললাম। তারপর একটুও দেরী না করে তারটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম আরামটা। সে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলো দীর্ঘ সময় এবং আবোল তাবোল প্যাচাল পাড়লো বউয়ের সঙ্গে—এবং আমার সঙ্গেও।

বিস্ময়ের ব্যাপার, আমি বিছানায় গেলে আহত বউটা আমাকে জড়িয়ে ধরে হামলে পড়লো আমার ওপর। তার মুখে একটা কথাও নেই। আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই কাটালাম সেই ভোর অব্দি। আমাকে হুঁশিয়ার করে দেবার পরিবর্তে সে বরং আমাকে সেদিন ছুটি নিতে বললো। কিন্তু ছুটি নিতে বললে কি হবে, আমার মন তখন চলে গেছে অন্য কোনোখানে। কাল সকালে চমৎকার ফার গায়ে দেয়া যে সুন্দরী বেশ্যাটার সঙ্গে পরিচয় হয়, আমি তার কথাই মূলত ভাবছিলাম। তারপর আমি ভাবতে শুরু করলাম আর এক মহিলার কথা। সে আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। এবং তারপর আমি একের পর এক চিন্তা করতে লাগলাম একটার পর একটা মেয়ে মানুষের কথা। এবং শেষ পর্যন্ত আমি ঘুমিয়ে পড়লাম, যে ঘুমের এক পর্যায়ে বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে আমার কাপড় চোপড় ভিজে গেলো।

সকাল সাড়ে সাতটার অ্যালার্ম বেজে উঠলো যথারীতি। আমি রোজকার মতো চেয়ারের ওপর রাখা আমার কোঁচকানো শার্টের দিকে

তাকালাম। কিন্তু 'দুত্তোর' বলে আবার আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। আটটা নাগাদ ফোন এলো হাইমের। সে বললো তাড়াতাড়ি এসো ; কেননা এখন স্ট্রাইক চলছে। কথাটা মিথ্যে নয়। স্ট্রাইক চলছিলো এক নাগাড়ে বেশ কদিন যাবৎ, যার তেমন কোন কারণ ছিলো না। কেবল আমাদের অফিসেই নয়। কোথাও সীমিত ভাবে, কোথাও বা ব্যাপক ভাবে, স্ট্রাইক চলছিলো দেশের সর্বত্র। অন্য সব জায়গার কথা আমার জানা নেই। তবে আমাদের অফিসে লাগাতার ধর্মঘটের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না ব্যাপারটা নিরর্থক মনে হচ্ছিলো আমার কাছে।

চার

এরকম অচলাবস্থা চলেছিলো দিনের পর দিন। অন্ততঃ নিরেট পাঁচটি বছর ছিলো এই বিশৃংখলার অন্তর্গত। মহাদেশ যুগপৎ বিপর্যস্ত হয়েছিলো প্রাকৃতিক এবং মানবিক বিপর্যয়ে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, ধুলিঝড়, তাপ-প্রবাহ, পঙ্গপাল, ধর্মঘট, হত্যা, আত্মহত্যা—এইসব মিলিয়ে সে যেন এক দীর্ঘ মেয়াদী জ্বর। সে যেন এক কালবেলা। এই অদ্ভুত সময়ে নিজেকে মনে হতো বাতিঘরের চূড়োয় বসে থাকা অসহায়, অক্ষম, নিঃসঙ্গ মানুষটির মতো। যার পায়ের নিচেই উন্মত্ত, ঢেউ, ডুবো-পাহাড় আর বানচাল জাহাজের ধ্বংসাবশেষ।

ভ্যালেসকার আত্মহত্যার সপ্তাহ খানেক আগে আমি ও'মারাকে নিয়ে মত্ত ছিলাম। তারপর অন্ততঃ দু'টি সপ্তাহ যাবৎ কেবল দুঃস্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন। পর পর বেশ কয়েকটি আকস্মিক-মৃত্যু। কয়েক জন বিচিত্র চরিত্রের মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। এদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়ে পলিন জ্যানাওস্কির। ষোলো অথবা সতেরো বছরের একটি ইহুদী মেয়ে। ঘর বাড়ি মা বাবা আত্মীয় স্বজন কেউ নেই হতভাগীর। সে আমার অফিসে এসে একটা কাজ চাইলো। অফিস তখন বন্ধ হবার মুখে। কিন্তু আমি তাকে বাইরে হাঁকিয়ে দেবো---তেমন অন্তর আমার নয়। ঠিক পরিষ্কার জানিনা, কেন; অথবা হয়তো কিছু কিছু জানি—আমি মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে যাবো বলে স্থির করলাম।

বালজাকের প্রতি তার আকর্ষণই মেয়েটার প্রতি আমার আকৃষ্ট হবার কারণ। সারাটা রাস্তা সে আমার সঙ্গে আলাপ করলো 'লষ্ট ইল্যুশন্স' সম্পর্কে। গাড়িটা ছিলো লোকজনে ভর্তি। আমরা দুজন গায়ে গায়ে লেপ্টে বসেছিলাম। আমার স্ত্রী দরজা খুলে তার স্বামীর পাশে অপরূপা এক কিশোরীকে দেখে বোকা বনে গিয়েছিলো। সে তার নিজস্ব নির্লিপ্ত ও নির্বিকার ভঙ্গীতে উপলব্ধি করলো ব্যাপারটা। কিন্তু আমার বুঝতে দেরী হলো না যে, মেয়েটিকে দেখাশোনা করার ব্যাপারে তাকে কিছু বলতে যাওয়া নিরর্থক। আমরা তিনজন এক টেবিলে বসে ডিনার খেলাম। কিন্তু খাওয়া দাওয়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী সিনেমা দেখতে চলে গেলো। এবার কাঁদতে শুরু করলো মেয়েটি। আমরা তখনো বসে আছি টেবিলে। ডিশ,

প্লেট সব আমাদের সামনে স্তূপাকার। আমি উঠে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়লাম। হাত দু'টি বাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরলাম। আমার খুব কষ্ট হলো ওর জন্যে। খুব দুঃখ। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, ওর জন্যে এখন কি করতে পারি। অকস্মাৎ সে দুহাতে আমার গলা জরিয়ে ধরে গভীর আবেগে আমাকে চুম্বন করলো। আমরা আলিঙ্গন-নাবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। হঠাৎ আমার মনে হলো, ছিঃ ছিঃ এ আমি কি করছি। এ তো অপরাধ্। তাছাড়া সিনেমা দেখার কথা বলে বাইরে বেরুলেও আমার স্ত্রী আশেপাশেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কিনা কে জানে। আমি মেয়েটিকে বললাম, চলো বাইরে যাই। ট্রলিতে চেপে কোথাও খানিটা ঘুরে আসা যাবে।

ম্যাণ্টেল পিসের উপরে রাখা ছিলো বাচ্চার পয়সা জমাবার ব্যাঙ্কটা। আমি চুপে চুপে ওটা টয়লেটে নিয়ে গিয়ে সব ক'টা পয়সা হাতালাম। অবশ্য ওর ভেতরে ছিলো মোটে পঁচাত্তর সেণ্ট। আমরা একটা ট্রলিতে চড়ে সমুদ্র তীরে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে দু'জনে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌছলাম, যেখানে কোনো লোকজন নেই—একদম ফাঁকা। আমরা বালির ওপর শুয়ে পড়লাম সটান। মেয়েটা খুবই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে ওকে ধর্ষণ করা ছাড়া কিছুই আর করবার ছিলো না তখন। আমি ভেবেছিলাম, সে পরে আমাকে দোষারোপ করবে। কিন্তু না, সেরকম কোনো লক্ষণ দেখা গেলো না তার মধ্যে। ও শুয়ে শুয়েই বালজাক সম্পর্কে বলতে শুরু

করলো আবার। মেয়েটার কথা বার্তায় আমার মনে হলো, খুব সম্ভব ওর লেখক হবার অভিলাষ ছিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন তুমি কি করবে? যাবেই বা কোথায়? জানালো—এ সম্পর্কে কিছুই ভাবেনি।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটি ওকে বড়ো রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে অনুরোধ করলো আমাকে। বললো, ভাবছি ক্লিভল্যণ্ড বা ওইদিকেই কোথাও যাবো। একটা গ্যাসোলিন-স্টেশনের সামনে ওকে যখন আমি ছেড়ে দিলাম, তখন মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। ওর পকেট-বইয়ের ভেতরে ছিলো মোটে পঁয়ত্রিশ সেণ্ট! বাড়ি ফেরার সময় কুত্তীর বাচ্চা বউটাকে আমার মনে হচ্ছিলো চিবিয়ে খেয়ে ফেলি। এরকম নিষ্ঠুরতার কোনো মানে হয়! আহা, মেয়েটার কোথাও যাবার জায়গা নেই। যীশুর কাছে আমি ওর মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করলাম। বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, আমার স্ত্রীর চোখে মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। যেন সে কিছুই জানেনা, কিছুই বোঝে না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অবশ্য এ আমি আগেই জানতাম!

সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো এতো রাতেও। ভাবলাম, রণহুংকার শিগগীরই কানে আসবে আমার। কিন্তু না, তা নয়। সে আসলে একটা জরুরী খবর দেবার জন্যেই রাত জেগে বসে ছিলো আমার জন্যে। ও রুরকি নাকি ফোন করেছিলো। জানিয়েছে, আমি যখনই ফিরি, তাকে যেন অবশ্যই একটা ফোন করি। আসলেও আমার তক্ষুণি ফোন করা দরকার—আমি বুঝি। কিন্তু

না, আমি করলাম না। ভাবলাম, কাপড় চোপড় ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বো এক্ষুণি।

যখন ঘুমে আমার চোখ দু'টো বুঁজে এসেছে—আচমকা টেলিফোন বেজে উঠলো। যা ভেবেছি। ও রুরকির গলা। অফিসে আমার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। সে জানতে চাইছে, টেলিগ্রামটা খুলে পড়তে পারে কিনা। আমি বললাম, অবশ্যই পারো। বাফেলো থেকে টেলিগ্রাম করেছে মনিকা। জানিয়েছে, সে তার মায়ের লাশ নিয়ে ট্রেনে রওনা হচ্ছে। ট্রেন গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে পেঁাছুবে ভোর বেলা। আমি ও রুরকিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিছানার দিকে হেঁটে গেলাম।

বউ কোন প্রশ্ন করলো না টেলিগ্রামের ব্যাপারেও। আমি শুয়ে শুয়ে কী করবো তাই ভাবতে লাগলাম। কথা হচ্ছে, মনিকার অনুরোধে যদি আমি সাড়া দিতে চাই, তাহলে পৈশাচিক পরিশ্রমের পরেও আবার এক্ষুণি আমাকে শয্যাত্যাগ করে ছুটতে হয় এক মুহূর্ত বিশ্রাম না নিয়ে। আমার রাশিকে আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম ওই মেয়েটির খপ্পর থেকে মুক্তি পেয়ে। আর সেই মেয়েটাই এখন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছে মায়ের মৃত দেহ সঙ্গে নিয়ে। ধেৎ! আচ্ছা ধরা যাক, আমি যাচ্ছি না। কি হবে তাহলে? কিছুই হবে না। লাশ দেখা শোনা করবার লোকের অভাব কখনো হয়না। বিশেষ করে সেই লাশের সঙ্গে যদি থাকে নীল চোখ আর সোনালী চুলের এক চটকদার মেয়ে! আমি আরো ভাবলাম, মেয়েটা হয়তো তার আগেকার সেই রেস্তোরার চাকরিতেই ফিরে যাবে।

আমি ওর সঙ্গে মিশেছিলাম ও লাতিন আর গ্রীক ভাষাটা ভালো জানতো বলে। নইলে কি আর মিশতাম? যাহোক, কৌতূহল আমাকে লাভবান করেছে। মেয়েটা যা গরিব ছিলো—উফ-ভাবা যায় না! ওকে অন্য কারণেও খানিকটা ভালো লাগতে পারতো, যদি ওর হাত দুটোয় তেলতেলে গন্ধটা না থাকতো। হাত দু'টোকে দেখে মলমে ডোবা মাছির কথাই মনে পড়তো আমার। ওর সঙ্গে পরিচয়ের ঘটনাটিও স্পষ্ট মনে পড়ে। সে রাত্রে আমরা অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছিলাম পার্কে। দেখতে ভালো। তার ওপর বেশ সচেতন আর বুদ্ধিমতী ছিলো মেয়েটা। মেয়েদের মধ্যে সেসময় খাটো স্কার্ট পরার চল হয়েছে। মনিকাও তাই পরেছিলো এবং তাতে তার জেল্লাটা বেড়েছিলো মন্দ নয়। কেবল তার হাঁটাচলা দেখবার আশাতেই রাতের পর রাত আমি ওই রেস্তোরাতে গেছি। উবু হয়ে টেবিলে টেবিলে খাবার সার্ভ করার কায়দা আর কাঁটা চামচ তোলার ঢংটা সত্যি দুর্দান্ত লাগতো আমার কাছে। ওর চকচকে চোখ আর চমৎকার পা দুটি দেখে হোমারের মন্তব্য মনে পড়তো। কাটা চামচ ধরা হাত দেখে মনে পড়তো সাফোর কবিতা আর পানপাত্র আঁকড়ে ধরা আঙুল দেখে আওড়াতে ইচ্ছে করতো ওমর খৈয়ামের রুবাই। কিন্তু ওই যে বললাম। বিদঘুটে তেলতেলে গন্ধ আর মার্কেট প্লেসের উল্টো দিকের বোর্ডিং রুমে ওর সেই নোংরা বিছানা—আহ্! এ দুটি ব্যাপার আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারিনি। আর জরথুস্ত্র কণ্টকিত দশ পৃষ্ঠার সেই বিশাল

প্রেম পত্র ? সে কথা কি ভুলবার ? আর সেই অভাবিত নীরবতা ? সে কথাই কি ভোলা যাবে ? যদিও পরে বড্ড বাঁচা গেছে বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি। না, আমি স্টেশনে আর গেলাম না। বরং তক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়লাম। এমনকি সকালে বউকে আমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে অফিসে একটা ফোনও করে দিতে বললাম। কথাটা যে একেবারে মিথ্যে বলেছি, তা নয়। এ মুহূর্তে অসুস্থ না হলেও—এক সপ্তাহের বেশি সময় হবে—অসুস্থতা আমার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলো।

দুপুরে অবশ্য আমি বাইরে বেরুলাম। অফিসের কাছে গিয়ে দেখি ক্রনস্কি আমার জন্যে রাস্তায় পায়চারী করছে। সে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে চায়। লাঞ্চ মানে সে আসলে এক মিশরী মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিতে চায়। মেয়েটি আদতে ইহুদী —তবে শরীরে মিশরীয় রক্ত থাকায় মিশরীয় বলেও মনে হয়। তুখোড় মাল। আলাপ টালাপ হলো। মনে হচ্ছিলো, এই নারীর জন্যে আমরা যে কোনো ঝুঁকি নিতে দেরী করবো না। যেহেতু অসুখের খবরটা অফিসে জানিয়ে দিয়েছি, তাই আর অফিসের দিকে পা বাড়ালাম না! হাঁটা দিলাম ইষ্ট সাইডের দিকে। ক্রনস্কি আমাকে আড়াল করে হেঁটে চললো, যাতে অফিস থেকে কেউ আমাকে দেখে না ফেলে। খানিকটা হাঁটবার পর মেয়েটি অন্য রাস্তায় চলে গেলো। আমরাও হ্যাণ্ডশেক করে আলাদা রাস্তায় চলে গেলাম যে যার মতো।

নদীর দিকে হেঁটে গেলাম আমি। বেশ ঠাণ্ডা। মেয়েটির কথা

কিছুক্ষণের মধ্যে সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। বাঁধানো নদীতীরে পা ঝুলিয়ে বসলাম। লাল ইট বোঝাই একটা নৌকা চলে গেলো। তা দেখে হঠাৎ মনিকার কথা মনে পড়ে গেলো আমার। মনিকা একটি লাশ নিয়ে নিউ ইয়র্কে পৌছুচ্ছে! নিউ ইয়র্কে লাশ— নাকি নিউ ক্যাসলে কয়লা! হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। সত্যি বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। তা লাশ নিয়ে মেয়েটি শেষ অব্দি কি করেছে? সে কি ওটা সত্যি সত্যি সঙ্গে নিয়ে গেছে নাকি ফেলে গেছে রাস্তার ধারে! সে কি আমাকে স্টেশনে না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছে। শাপ শাপান্ত করছে! আমি মনে মনে ভাবলাম, সে কি কল্পনাও করতে পারবে যে আমি এখন, এ মুহূর্তে এই নদীর ঘাটে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছি? বসে আকাশ পাতাল ভাবছি! ···মনিকার চিন্তাটা মনের ভেতর থেকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে না তাড়াতেই সেখানে ভর করলো পলিন। আমি কল্পনার নেত্রে দেখলাম, মধ্যরাত্রের হাইওয়ের ওপর দু'হাত শূন্যে তুলে হেঁটে যাচ্ছে অসহায়া মেয়েটি। অবশ্য ওর সাহসের তারিফ করতেই হয়। ওর যে অসম্ভব সাহস তা স্বীকার না করে পারা যাবে না! তবে এটা খুবই তাজ্জব ব্যাপার যে, ওভাবে বিতাড়িত হয়েও ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপটুকু পর্যন্ত ছিলো না। হয়তো ও ছিলো বে-পরোয়া। পাত্তাই দেয়নি এরকম একটা সমস্যাকে। আর তার বালজাক? এটাও এক আজব ব্যাপার যাই বলো। এবং বালজাক কেন? অন্য কেউ কেন নয়? সে যাক, ওটা তারই ব্যাপার। অবশ্য তাকে খাওয়ানো হয়েছিলো প্রচুর। আর এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা হবার

আগ পর্যন্ত ওতে ওর চলে যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু এই পুঁচকে ছুড়িটাই কি লিখিয়ে হতে চেয়েছিলো? চাইবে নাই বা কেন। সংসারে সবাই তো একটা না একটা হেঁয়ালীর শিকার। মনিকা তার ব্যতিক্রম হয় কি করে? হ্যাঁ, সবাই লেখক হতে চাইছিলো।

লেখক—ইশ্!

মগজ থেকে পলিনকেও ভাগালাম। কেমন কেমন লাগছিলো যেন আমার। সূর্যের আঁচে ফ্লাইয়ের নিচটা জ্বলে যাচ্ছিলো। তাই ওখান থেকে উঠে গিয়ে আমি ড্রিংকিং-ফাউন্টেনে মুখ ধুলাম। বিচ্ছিরি গরম পড়েছে এখন। গলে প্যাচ প্যাচ করছে রাস্তার পীচ। খানা খন্দে জমে থাকা পচা আবর্জনার ওপর মাছি উড়ছে ভন ভন করে। আমি ঠেলা গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলাম শূন্য দৃষ্টিতে। আসলে কি কালক্ষেপন করছিলাম আমি? কিন্তু কেন সেকেণ্ড এভিন্যুতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেলো সেই মিশরীয়-ইহুদী মেয়েটির কথা। মনে পড়লো, সে একবার বলেছিলো, টুয়েলফথ্ ষ্ট্রীটের রুশ রেস্তোরার ওপরেই তার আস্তানা। ওই দিকটায় যাবার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিলো না। কিন্তু পাজি পা জোড়া কখন যে আমাকে সেই রুশরেস্তোরার সামনে এনে ফেলেছে, খেয়ালই করিনি। একটু চমকে উঠেই থমকে দাঁড়ালাম আমি। দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়েকটি মুহূর্ত। হঠাৎ একটা দৌড় লাগালাম জোরে। এক লাফে ডিঙোলাম সিঁড়ির অন্তত তিনটে ধাপ। হলঘরের দরজা ছিলো খোলা। আমি এ তলা-ওতলায় পাগলের মতো খুঁজতে লাগলাম সেই মেয়েটির ডেরা। দরজার ওপর

তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে শুরু করলাম একটি নাম।

অবশেষে পাওয়া গেলো। এক দম ওপর তলাতে ওর আস্তানা। আমি দরজায় নক করলাম। সাড়া শব্দ নেই। আবার কড়া নাড়লাম আমি। এবারে আরেকটু জোরে। মনে হলো, ভেতরে কেউ নড়াচড়া করছে। একটু পরে দরজার ওপাশে থেকে কার জড়ানো গলার আওয়াজ। সেই সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। আমি ভেতরে ঢুকে দেখি, ঘর অন্ধকার। কিমোনো পরা মেয়েটির অর্ধনগ্ন দেহের ওপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়েই পড়েছিলাম। মনে হলো তার ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটেনি এবং কে যে তার হাত দুটো ধরে আছে, তাও বোধহয় সে পরিষ্কার আঁচ করতে পারছে না। চট্‌কা ভাঙ্গতেই কিন্তু মেয়েটি ধড়মড়িয়ে উঠে ছুটে যেতে চাইলো আমার হাত ফস্‌কে। কিন্তু পারলো না। আমি আরো শক্তভাবে তাকে জাপ্টে ধরে চুমো খেলাম এবং টানতে টানতে নিয়ে গেলাম জানালার ধারে রাখা কৌচটার দিকে। সে তখন হাত-ইশারা করে বোঝালো যে, 'দরজা খোলা রয়েছে। কাজেই'—। কিন্তু পাছে সে পিছ্‌লে বেরিয়ে যায় মুঠো থেকে, সেই আশঙ্কায় আমি ওকে জাপ্টে ধরেই এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। তার নরম পাছাটা আলতো ভাবে গিয়ে লাগলো দরজার পাল্লায়। ব্যাস্—সিসেম্ বন্ধ্। দরজায় তালা লাগলাম আমিই। অবশ্য এক হাতে ওকে ধরে-অন্য হাতে। তারপর ওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে ফেললাম রুমের মাঝ খানটায়। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেললাম ফ্লাইয়ের বোতাম। আর আমার গুপ্ত দণ্ডটি বের করে ঢুকিয়ে দিলাম যথাস্থানে।

মেয়েটি তখনো এতো নিদ্রাতুর ছিলো যে আমার মনে হচ্ছিলো একটি যন্ত্র-মানবীর সঙ্গে আমি রতি ক্রিয়ায় লিপ্ত। আমি এটাও লক্ষ্য করিছিলাম যে, অর্ধজাগ্রত অবস্থায় ধর্ষিত হতে কীরকম লাগে, মেয়েটি তা উপভোগ করছিলো। তবে দুশ্চিন্তার ব্যাপার এই, আমি যতোবার তাকে সজোরে চেপে ধরছিলাম, ততোবারই সে বেশী নড়াচড়া করছিলো। যতোই সে চেতনা ফিরে পাচ্ছিলো, ততোই যেন সে ভীত হয়ে উঠছিলো। এখন চমৎকার ভাবে মৌজ লোটায় ব্যাঘাত না-করে তাকে আবার ঘুমই বা পাড়াই কি করে!

আমি তার দেহের অর্ধেকটা কৌচের ওপর নিয়ে ফেললাম।

বাকি অর্ধেক মেঝতেই আছে। মাগির সে কি তড়্পানি—বাপ্স! যতোবার চেপে ধরি ততোবারই বায়েন মাছের মতো সে খালি পিছ্লে যেতে চায় আমার বাহুবন্ধন থেকে। আমি যতোক্ষণ থেকে তাকে লাগাচ্ছি, সে তার দু'চোখের পাতা একটি বারও খুলেছে কিনা, সন্দেহ।

লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে বারবার বলছিলাম, মিশরের মজা, মিশরের মজা! আর মৌজ ফুরোবার আগেই গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশনে মায়ের লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মনিকার কথা, পঁয়ত্রিশ সেণ্ট সম্বল নিয়ে মধ্যরাতের হাই ওয়েতে হারিয়ে যাওয়া পলিনের মুখ মনে পড়ে গেলো আমার। আমি শেষবারের মতো পিষে ফেলতে যাচ্ছি মেয়েটাকে। আচমকা দরজায় তীব্র করাঘাত। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথম বারের মতো চোখ খুলে গেলো ওর। ভয়ে সারাটা মুখ মুহূর্তে সাদা হয়ে গেছে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে আমার দিকে

চোখ তুললো সে। আমি তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই—আশ্চর্য, ও আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।

সাবধান, একটুও নড়াচড়া কোরো না—মেয়েটি নিচু গলায় আমার কানে কানে বললো—অপেক্ষা করো! কিন্তু তক্ষুণি আবার কড়া নাড়ার আওয়াজ। এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো ক্রনস্কির গলা। সে বলছে—থেলমা, আমি এসেছি লক্ষ্মী! দরজা খোলো! শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়লাম। এবং আগের অবস্থায় ফিরে যেতে আমাদের একটুও দেরী হলোনা। আবার সবকিছু স্বাভাবিক। এবং আবার ওর চোখ দু'টো বুজে এলো আস্তে আস্তে। এবার আর তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। জীবনে আশ মিটিয়ে যতোবার করেছি, এটা ছিলো তারই একটা। মনে হচ্ছিলো, এই ভাবেই চলবে অনন্তকাল। এর বুঝি আর বিরতি নেই। ওদিকে বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। উত্তেজিত পায়চারীর স্পষ্ট শব্দ। ক্রনস্কি নিশ্চয়ই চলে যায়নি।

সঙ্গমের শেষে মেয়েটি আমার মুখের দিকে পরিপূর্ণ চোখে তাকালো। আমি একটি কথাও বললাম না। আমার মাথার মধ্যে এখন চিন্তা একটাই। তাহলো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব, এখান থেকে কেটে পড়া। বাথরুমে গিয়ে ধুয়ে টুয়ে এলাম আমরা। তারপর আমি ওর রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ক্রনস্কি নেই—চলে গেছে। আপদ গেছে—ভেবে করিডোরে পা রেখেছি, হঠাৎ দেখি দরজার নিচে পড়ে আছে একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে ক্রনস্কির হাতের লেখা। সে লিখেছে—তার স্ত্রীকে এই মাত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

হাসপাতালে। তার ইচ্ছে, থেলমা হাসপাতালে গিয়ে একবার দেখা করে। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ব্যাটা টের পায়নি!

পরদিন আমাকে টেলিফোন করলো ক্রনস্কি। ওর স্ত্রী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে অপারেশন টেবিলে!

সন্ধ্যায় খাবার টেবিলে বসেছি—ডোর-বেল বেজে উঠলো। দরজা খুলে দেখি, ক্রনস্কি দাঁড়িয়ে আছে উদভ্রান্তের মতো। আমি ওকে কি সান্তনা দেবো, ভেবে পেলাম না। আমার স্ত্রী অবশ্য যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করলো—যা আমার ভালো লাগলো না মোটেই। আমি ক্রনাস্কিকে বললাম, চলো বাইরে কোথাও যাওয়া যাক।

আমরা দীর্ঘ সময় নিঃশব্দে হাঁটলাম। একটা পার্কের শেষ মাথায় ঘন ঘাসের ঝোপ। আমরা সেখানে হাঁটাহাঁটি করলাম অনেকক্ষণ। কুয়াশা এতো গাঢ় হয়ে পড়েছে যে, সামনে কিছু দেখা যায় না। মনে হচ্ছিলো, আমরা পানির নিচ দিয়ে সাঁতরে চলেছি। কারো মুখে কোনো কথা নেই, আমরা নিঃশব্দে হাঁটছিলাম—হঠাৎ ফোঁপাতে শুরু করলো ক্রনস্কি। আমি চমকে পেছন ফিরে তাকিয়েছি। দেখলাম, এক ধরনের রহস্যময় হাসি মুখে নিয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে। আশ্চর্য! সে বললো—মৃত্যুকে মেনে নেয়া কতো কঠিন! আমি ক্রনস্কির কাঁধে হাত রেখে ম্লান হাসলাম। বললাম—বলো তোমার বুকের মধ্যে যতো কথা আছে, বলো। বুকটা হালকা হোক।

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এবার ঘাস ঝাড়ের ভেতর দিয়ে। যেন আমরা সমুদ্রের তলা দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কুয়াশা এতো ঘন যে ক্রনস্কির দেহটা অবছা আবছা চোখে পড়ছে এখন। সে

বলছিলো এরকমটা যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম। সে প্রগাঢ় স্বরে উচ্চারণ করলো—অথচ বেঁচে থাকাটা ছিলো কতো সুন্দর! স্ত্রীর অসুখ বাড়বার আগের রাত্রে ক্রুনস্কি নাকি একটা স্বপ্ন দেখেছিলো। দেখছিলো, সে তার পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে।

আমি অন্ধকারে ছুটোছুটি করছিলাম আর নিজের নাম ধরে বার বার ডাকছিলাম। মনে পড়ে, অবশেষে আমি পৌঁছলাম একটা ব্রীজের কাছে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, আমি তলিয়ে যাচ্ছি পানির নিচে। মানে অন্য এক আমি। সঙ্গে সঙ্গে এই আমি ঝাঁপ দিলাম। দেখলাম তর তর করে ভেসে যাচ্ছে ইয়েতার মৃত দেহ। স্বপ্নের কথা বলতে বলতে আচমকা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো ক্রুনস্কি। যেন আগের বক্তব্যের খেই ছেড়ে না দিয়েই বললো—গতকাল অমি যখন থেলমার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছালাম। ভেতরে তুমিও ছিলে তাইনা? আমি জানতাম, তুমি আছো—তাই নাছোড় বান্দার মতোই অপেক্ষা করছিলাম। সহজে চলে যাচ্ছিলাম না। আমি এ-ও জানতাম, ইয়েতা মারা যাচ্ছে। জানো, আমি মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা আমার স্ত্রীর পাশে থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু একা একা হাসপাতালে যেতে আমার ভয় করছিলো।

আমি চুপ করেই ছিলাম। ক্রুনস্কি বলে চললো—যে মেয়েটিকে আমি প্রথম ভালোবেসেছিলাম, সে-ও মারা যায় একই ভাবে। আমার বয়স তখন খুবই কম। ব্যাপারটাকে কিছুতেই আমি ভুলতে পারছিলাম না। প্রতি রাত্রেই আমি গোরস্থানে যেতাম। চুপ চাপ বসে থাকতাম তার কবরের পাশে। লোকে ভাবতো আমি অন্য

মনস্ক হয়ে যাচ্ছি। আমি দেখলাম, না, তা নয়। গতকাল আমি যখন বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, সেই স্মৃতিই আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো। একদিন ট্রেনটনের সেই কবরখানায় গেছি আমি। মৃত মেয়েটির বোনও আমার পাশে বসা। সে বললো, এভাবে বেশি দিন চললে আমি নাকি পাগল হয়ে যেতে পারি। আমি ভাবলাম, আমি ইতিমধ্যেই পাগল হয়ে গেছি। এবং আমার পাগলামো প্রামান করবার জন্যেই কবরটা দেখিয়ে বললাম—ওকে নয়—আসলে আমি তোমাকেই ভালবাসি।

আমরা ঘাসের ওপর জড়াজড়ি করে পরস্পরকে চুমো খেলাম। তারপর ওর বোনের কবরের পাশে ফেলেই ওকে ধর্ষণ করলাম।

পাঁচ

মনে হয়, ব্যাপারটা ছিলো আমার সেই বিদ্‌ঘুটে ব্যারামের এক চমৎকার চিকিৎসা। কেননা ওই ঘটনার পর থেকে আমি তার কবরের কাছে তো ঘেঁষিই না। এমনকি ওর কথা আর কখনো চিন্তাও করিনি। কেবল এই তো, গতকাল ; হ্যাঁ হ্যাঁ—গতকালই থেলমার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়েছিলো আমার। ক্রনস্কি বললো—কাল যদি দরজাটা একবার খুলে যেতো, নির্ঘাত গলা টিপে মারতাম তোমাকে। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না, আমার কীরকম লাগছিলো। আমার মনে হচ্ছিলো,

তুমি একটি কবর ভেঙ্গে ফেলেছো এবং আমার প্রেমিকার মৃতদেহ ধর্ষণ করছো। ···তুমি হয়তো বলবে, তা আজ রাত্রে তোমার কাছে এসেছি কেন? এর জবাবে আমি বলবো—তুমি আমার অন্তরঙ্গ। যদিও তুমি একজন ইহুদী নও। তুমি কিছুই দাওনা। ···আচ্ছা, তুমি কি কখনো দেবদূতদের বিদ্রোহ বইটা পড়েছো?

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পার্কটাকে ঘিরে রাখা ছোট্ট রাস্তাটির ওপরে এলাম। বুলেভারের আলোক মালা কুয়াশার মধ্যে নাচানাচি করছিলো। ক্রনস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মতোই তা থমথমে। মনে হলোনা, ওকে কোনো রসিকতা দিয়েই আজ হাসানো যাবে। আমি কিছুটা ভয় পেলাম একথা ভেবে যে, একবার যদি সে হাসতে শুরু করে সে হাসি কখনো থামবে না। প্রথমেই আমি প্রসঙ্গ তুললাম আনাতোল ফ্রাঁসের। তারপর অন্যান্য লেখকদের প্রসঙ্গে চলে এলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ক্রনস্কির এদিকে আদপেই মন নেই। হঠাৎ আমি একটা নাম উচ্চারণ করলাম। জেনারেল আইভলজিন! ব্যাস্—যেন লাফিং বম্বটা ফাটলো। হো হো করে হেসে উঠেলো ক্রনস্কি। প্রচণ্ড অট্টহাসি। সর্বনাশ—হাসি যে আর থামেনা! আমি ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু আর কুলোতে না-পেরে ক্রনস্কি তার তলপেট চেপে ধরলো। হাসির দমকে তার দুচোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে। ফোঁপানির ভেতর দিয়ে কোনোক্রমে সেই হাসি থামলে সে বললো—অবশ্য আমি জানি, তুমি আমার মঙ্গল চাও। শালা নেড়ি কুত্তার ছাও! ···ওরে শুয়োর তুই নিশ্চয়ই একটা জারজ ইহুদী।

কেবল তা তুই জানিস না—! এখন বলোতো চাঁদু? কাল কীরকমটা চালালে! শেষ করতে পেরেছিলে তো। কেমন, আমি বলিনি—মালটা শাসালো, একটা ডাঁসা পেয়ারা! তুমি কি জানো, ও কার সঙ্গে থাকে? হায় যীশু—ভাগ্যিস ধরা পড়োনি ব্যাটার হাতে। ব্যাটা এক রাশান কবি—তুমিও তাকে চেনো। আমিই একদিন ওর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম কাফে রয়্যালে।

সাবধান, লোকটা যেন ঘুনাক্ষরে ঘটনাটা টের না-পায়। টের পেলে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে তোমাকে। তারপর ওই ব্যাপারটা নিয়ে মস্ত একটা পদ্য লিখে একগুচ্ছ গোলাপের সঙ্গে তা পাঠিয়ে দেবে মেয়েটার কাছে। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় এক অ্যানার্কিস্ট কলোনিতে। ওর বাপ ছিলো নিহিলিষ্ট। পুরো ফ্যামিলিটাই সাংঘাতিক। যাই হোক, তুমি হুঁশিয়ার থেকো বৎস। আরে মিয়া, আমি তো তোমাকে একটা সুযোগ করে দিতামই। তা, তুমি যে এতো চটজল্‌দি কেল্লা ফতে করবে, কে ভেবেছিলো? তুমি জানো, ওর সিফিলিস থাকতে পারে? আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছি না। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি!

ক্রনস্কি তার নিজস্ব ইহুদী ঢংয়ে জানাচ্ছিলো, সে আমাকে কীরকম পছন্দ করে? এবং তার পছন্দের ধাক্কায় সে আমার চারিদিকে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলো। ধুলিসাৎ করে দিতে চেয়েছিলো আমার স্ত্রী, আমার চাকরি বন্ধু বান্ধব, তার ভাষায় নিগ্রোখান্‌কি ভ্যালেসকা ইত্যাদি ইত্যাদি সবকিছুকেই। —আমার মনে হয়, একদিন তুমি মস্ত নামকরা লেখক হবে। সে বললো। তবে

হ্যাঁ—সে যোগ করে—প্রথম প্রথম তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে। কেননা কষ্ট শব্দটা বলতে যে কি বোঝায়, তা এখন পর্যন্ত তুমি জানো না। যদিও তুমি ভাবো যে তুমি কষ্ট করছো। তুমি প্রথমে প্রেমে পড়েছিলে। নিগার মাগিটা—তা তুমি নিশ্চয়ই ওর প্রেমে পড়োনি? পড়েছো? তুমি কি একবারও ভালো করে ওর পাছাটা দেখেছো? দেখেছো, কি ভাবে সেটি ছড়িয়ে পড়ছে। পাঁচ বছরে ওর চেহারাটা হবে ঠিক জেমিনা চাচীর মতো—এ আমি হলফ করে বলে দিলাম। তুমি দেখে নিও। ওর পাশে তখন একটুও মানবে না তোমাকে। তুমি বরং একটা ইহুদী মেয়ে বিয়ে করো না কেন? জানি তুমি তার প্রশংসা করবে না। কিন্তু সে-ই হবে তোমার জন্যে ভালো।

প্রথমে তোমার যে জিনিষটা দরকার, তা হলো দৃঢ়তা। তোমার শক্তি হেথায় হোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শোনো, অষ্ট পহর ওই জারজ বোবার বাচ্চাদের নিয়ে মেতে থাকো কেন? ফালতু লোক জড়ো করার ব্যাপারে তোমার সত্যি প্রতিভা আছে। দরকারী কাজে মন দিচ্ছো না কেন তুমি বলোতো? এই চাকরি ছেড়ে দাও। অন্য কোথাও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বিরাট সম্ভাবনা। বিরাট ব্যক্তিত্ব হবে তুমি অন্য কিছুতে আত্মনিয়োগ করলে। ধরো শ্রমিক-নেতাই হলে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তুমি কি হবে, তা ঠিক জানিনা। তবে হ্যাঁ—সবার আগে ওই কুড়োল-মুখো বউটার হাত থেকে তোমার মুক্তি পেতে হবে। উফ্—যখন ওই মেয়েলোকটার ওপর আমার চোখ পড়ে, মনে হয় থুথু দিই। আমার মাথায়ই আসেনা তোমার

মতো একটা লোক ওই রকম একটা কুত্তিকে কি করে বিয়ে করতে পারলো। কি দেখে মজেছিলে হে? অষ্ট পহর ভিজে থাকা ওর এক জোড়া ডিম্বকোষ দেখে? মনে তো হয়—যৌনতা তোমার মগজের মধ্যে। না না, ঠিক তা নয়—আমি বলতে চাইছি, তোমার একটা অনুভূতি প্রবন মন আছে। কিন্তু তোমার ভেতর বাছবিচার বলে কিছু নেই—এটাই আমার কাছে ঘেন্নার ব্যাপার। যাকে পেলে, তাকেই লাগালে। ধেৎ! তুমি যদি এরকম একটা রোমান্টিক-জারজ না-হতে; আমি কসম করে বলছি—ইহুদী হতে। তোমার ভিতরে একটা কিছু আছে। কিন্তু তা প্রকাশ করার ব্যাপারে তুমি একটা কুঁড়ের বাদশা। আমি লক্ষ্য করেছি এবং ভেবেছি, তুমি যেসব কথা বলো, যদি সেইগুলোই স্রেফ লিখে ফেলতে পারতে! তুমি আমার চেনা—আমেরিকানদের থেকে আলাদা। অনেকগুলো নোংরা ব্যাপার তোমার ভেতরে নেই। তুমি জানো না, তোমার মহত্ত্ব কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

অবশ্য তোমার মাথায় খানিকটা ছিটও আছে। আমার ধারণা, ব্যাপারটা তুমিও জানো। তোমাকে আমার ভালো লাগে আর একটা কারণে। তুমি আমাকে কখনো সহানুভূতি দেখাও না। আজকেই যদি তুমি উল্টোপাল্টা কিছু বলতে—তাহলে আমি পাগল হয়ে যেতাম। তুমি যখন জেনারেল আইভলজিনের প্রসঙ্গ তুললে তখনই কথাটা আরেকবার প্রমানিত হলো যে তোমার মধ্যে সত্যি কিছু আছে। তবে হ্যাঁ, যৌনতার বল্গাটাকে এক্ষুনি টেনে ধরা দরকার তোমার। নইলে বিপদ আছে। কি যেন একটা তোমাকে

ভেতরে ভেতরে খেয়ে ফেলেছে। সেটা কি, আমি তা জানি না। তবে খাচ্ছে। আগা পাশতলাই তো চিনি আমি তোমাকে। কখনো কখনো ভাবি, তুমি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছো এ দুনিয়ায়। অবশ্য এ কথা ভেবোনা যে আমি তোমার মর্মর-মূর্তি তৈরী করার কথা চিন্তা করছি। তোমার মধ্যে যদি সামান্য আত্মবিশ্বাসও থাকতো, তবে নির্ঘাত তুমি আজকের পৃথিবীতে মস্ত মানুষ হতে পারতে। তোমার লেখক হবার দরকারও পড়তো না। তুমি হতে পারতে আর এক যীশুখৃষ্ট। হেসো না, আমি ঠিক কথাই বলছি। নিজের সম্ভাবনা সম্পর্কে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। নিজের কামনা বাসনা ছাড়া তুমি অন্য সব ব্যাপারেই অন্ধ।.....তুমি কি বিশ্বাস করবে, তোমার এখানে আসবার আগে আমি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম? এখন ভাবছি, তাতে কি সে ফিরে আসতো।

দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়েই জন্ম আমার। আমি যেখানেই গেছি সেখানেই ঘটেছে অমঙ্গল। কিন্তু আমি তাতে হতাশ হইনি। এই পৃথিবীতে আমি ভালো কিছু করতে চেয়েছি। শুনে তুমি হয়তো কৌতুকবোধ করছো। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি অপরের জন্যে সত্যিই কিছু করতে চেয়েছি।

কথা বলতে বলতে আচমকা সে থেমে গেলো। আমি বিচিত্র এক ধরনের হাসির রেখা ফুটে উঠতে দেখলাম ওর মুখে। যেন আমি আবহমানের হতাশ এবং অক্ষম এক ইহুদীকেই দেখতে পাচ্ছি। যার আত্মহত্যার ক্ষমতাটুকুও নেই। এখন, এ মুহূর্তে ওই লোকটার মতো, আমিও যেন হতাশায় আক্রান্ত হচ্ছি। আমি

নিজের কথা চিন্তা করলাম। যদি কেবল গায়ের এই চামড়টা আমরা বদলাতে পারতাম।

বাড়ি ফিরে প্যান্ট খুলে রাখবার সময় শয়তানটার সাবধানবানী আমার মনে হলো। আমি আমার লিঙ্গের দিকে তাকালাম। আগের মতোই নির্দোষ, নির্ভেজাল। বললাম, কি হে মুনুমিয়া, নিশ্চয়ই বলবে না তোমার সিফিলিস হয়েছে?···তারপর মাংস-দণ্ডটি হাতে নিয়ে বেশ খানিকটা রগড়ালাম। সোজা কথায় হস্ত-শিল্পের চর্চা করলাম। কিছুক্ষণ পর বীর্যপাত হলো। কিন্তু সবকিছু স্বাভাবিক—আগের মতোই। সিফিলিসের কোনো লক্ষণই নেই এতে। আমি অমন রাশিতে জন্মাইনি।

সেদিন অপরাহ্নে বউ ফোন করলো বাসা থেকে। জানালো, তার বন্ধু অরলিনকে এই মাত্র ভর্তি করা হয়েছে মানসিক-হাসপাতালে। ছেলেবেলায় কানাডায় ওরা একই কনভেন্টে পড়তো। গানও শিখতো একসঙ্গে।

এবং সমবেত ভাবে করতো আধ্যাত্ম্য সাধনা। আমি ক্রমে ক্রমে ওদের সবার সঙ্গেই পরিচিত হই। এদের মধ্যমনি ছিলো সিস্টার অ্যান্টোলিনাও। ঘোর ধার্মিক। আমি বলবো না যে সমবেত-সাধনার চূড়ান্ত অবস্থাই তাদের একজনকে উন্মাদাশ্রমে ঠেলে দিয়েছে। বরং কনভেন্টের রুদ্ধশ্বাস পরিবেশই এর জন্যে দায়ী। তারা সবাই ছিলো অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে এলো আমার পুরনো বন্ধু ম্যাক গ্রেগর। বয়েস এখনো ত্রিশ পেরোয়নি। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিলো, বার্ধক্য জনিত

রোগে ভুগছে। সে বললো—আগেই বোঝা গিয়েছিলো যে অরলি-নের ভেতরে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। কেননা এক রাত্রে সে যখন জোর করে ওকে লাগাতে চায়, মেয়েটা মৃগী রোগী মতো কাঁপতে শুরু করলো! অবশ্য কাঁদার চেয়ে সে কথাই বলছিলো বেশি। বলছিলো, সে জিতেন্দ্রীয় জীবন-যাপনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হঠাৎ আবার কান্না থামিয়ে হাসতে শুরু করলো। আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি যখন শপথ নিয়েছো, তখন এসব কাজ আর নাই বা করলে। তবে তোমার হাত দিয়ে এটা ধরো—বলে আমার লিঙ্গের দিকে ইশারা করলাম। যীশু—যেই নাকি আমি একথা বলেছি, সে সাংঘাতিক ক্ষেপে উঠলো। বললো—আমার নিষ্পাপ দেহকে নষ্ট করতে চাও? তারপর এমন জোরে আমার নুনু টিপে ধরলো যে আমার প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। সে আবার কাঁদতে শুরু করছিলো। শপথ করছিলো এবং নানা রকম আধাত্মিক কথা-বার্তা বলছিলো অনর্গল।

ওর এ অবস্থা দেখে হাঠৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেলো আমার। তোমার একটা মোক্ষম ওষুধের কথা। সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে একটা চড় কষালাম আমি। কাজ হলো ম্যাজিকের মতো। বিনা সর্তে আত্মসমর্পন। আমি আর দেরী না করে যথাকর্তব্য—! এবং তার পরেই তো আসল মজা। তুমি কি কখনো কোনো মাথা খারাপ মেয়েকে করেছো? ওহ্—দারুন অভিজ্ঞতা! ওকে যখন লাগাচ্ছিলাম, সে এমন ভাবে কথাবার্তা বলছিলো যে, কী হচ্ছে তা সে জানেই না। ব্যাপারটা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে

পারবো না। ধর্ষিতা হতে হতে একটি মেয়ে আপেল খাচ্ছে—এর-কমটা তুমি কখনো দেখেছো কিনা আমার জানা নেই। ওহ্, সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার! যাহোক, তারপর কি হলো, সেকথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে? আমরা যখন শেষ করলাম তখন ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো, তোমাকে ধন্যবাদ! শোনো —এখানেই শেষ নয়। সে বিছানা থেকে উঠে ঘরের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর আমার জন্য যীশুর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করলো। আমার স্পষ্ট মনে আছে, সে বলছিলো, অনুগ্রহ করে ম্যাককে একজন সংখ্যুস্টানে রূপান্তরিত করুন। ভাবতে পারো?

ঃ আজ রাত্রে তোমার কী প্রোগ্রাম? আমাকে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকগ্রেগর।

ঃ তেমন কিছু না।—জবাব দিলাম আমি।

ঃ তাহলে 'আমার সহিত আইস'! একটা চিড়িয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। নাম পলা। সেদিন রাত্রে ওকে ভাও করেছি রোজল্যাণ্ড থেকে। এটা পাগ্‌লি নয়। তবে বলতে পারো বামাক্ষ্যাপা। সুন্দরী এক বনপরী। ওর সঙ্গে তোমাকে নাচাবো আমি। দেখবো তোমার মাজার জোর। শোনো, ওর সঙ্গে নাচবার সময় যদি তোমার প্যান্টি নষ্ট না হয় তাহলে আমি কুত্তার বাচ্চা! চলো চলো। শিগ্‌গীর!

এইম্যাক গ্রেগর এক আজব চীজ। মেয়েদের যোনি ছাড়া এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সে আর কিছুই বোঝেনা। অষ্ট পহর এ নিয়েই তার জপ

তপ—এ নিয়েই তার কায়কারবার। রোজল্যাণ্ডে যাবার আগে একটা বারে বসে আমরা মদ খেলাম। এক চুমুকে যেমন তেমন দুই চুমুকেই অতীত স্মৃতিরা যেন হাম্‌লে পড়তো ম্যাকের ওপর। আর সে স্মৃতি যে কিসের, তা বলাই বাহুল্য। আজও দুপাত্র পেটে পড়তেই তার মুখের ছিপি খুলে গেলো।

ওইসব আকাম কুকাম করতে করতেই ওর লিঙ্গটি অসুস্থ দুর্বল, ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। তবুও যাকে তাকে যেখানে সেখানে কু-প্রস্তাব দেয়া তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। এক মিনিটর জন্যে ওপর তলায় আসবে। তোমাকে আমার ধন দেখাবো! এ ছিলো তার ধরতাই-বুলি। দিনে বহুবার ব্যবহৃত যন্ত্রটি নিয়ে কখনো কখনো সে যেতো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার পয়-পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে, তাকে মদের মাত্রা কমিয়ে ফেলবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু ডাক্তারের সে পরামর্শ ম্যাকের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতো।

কখনো বা নিজের বুক সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠতো সে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই কাশতে শুরু করতো। ওহ্—সে কি কাশিরে বাবা! আবার কোনো মেয়ের পেছনে ধাওয়া করার সময় ভয়ে কুঁকড়ে থাকতো সে আগে থেকেই। যদি ফস্‌কে যায়? আবার মেয়েটা বশে এলেই তার দুশ্চিন্তা আরম্ভ হতো, কি করে এর খপ্পর থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

রোববার ভোরে টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গলো আমার। বন্ধু ম্যাক্সি জানালো আমাদের আর এক সাঙাতের মৃত্যু-সংবাদ।

খবরটা পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। ম্যাক্সি অবিরাম বক্ বক্ করছিলো। কিন্তু এ সংবাদে শোকগ্রস্ত না হয়ে বরং কিছুটা উল্লসিতই হলাম আমি। যাক বাওয়া, পথের কাঁটা দুর হলো। ব্যাটার অত্যাচারে ওর বোনটার ধারে কাছে ঘেঁসা যেতোনা। এবার ? এবার কাকে আগলাবি যথের মতো! লটিকে আমি অনেকবার শোয়াতে চেয়েছি। কিন্তু একটা কারণে আমি বার বার ব্যর্থ হচ্ছিলাম। এবার দুপুরের দিকে আমি সহজেই ওর বাসায় যেতে পারবো—অন্ততঃ ভাইয়ের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করতে। হয়তো ওই সময়ে ওর স্বামীটা অফিসেই থাকবে। গ্যাঞ্জাম করবার মতো কেউ আশে পাশে থাকবে না বলেই তো মনে হয়।

আমি কল্পনার চোখ দিয়ে দেখলাম, লটিকে আলিঙ্গন করে আঁচ দিচ্ছি। শোকাকুলা রমনীকে ম্যানেজ করার মতো সহজ কাজ আর হয় না। মেয়েটি সত্যি সুন্দরী। চোখ দুটি বেশ বড়ো বড়ো। কি বলে ? না—আয়ত নেত্র, কল্পনা করলাম ওকে কৌচে শোয়াচ্ছি আমি! খুব আস্তে আস্তে। লটি হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে মানুষ, যারা ধর্ষিত হবার সময় গান বা যন্ত্র-সঙ্গীত শুনতে ভালোবাসে। আর বীর্যপ্লাবনে যাতে কৌচ নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকে, পাছার নীচে আগে থেকেই তোয়ালে বিছিয়ে রাখে! কিন্তু ঘাপলাটি হয়েছে আজ রোববার! ছুটির দিন। অতএব লটির স্বামী তো বাসাতেই থাকবে। এটা নিশ্চিত। আমি বিছানায় ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে হিসেব করতে লাগলাম—লটি এবং আমার ব্যাপারে ওর ভাইটা কতোবার বাগড়া দিয়েছিলো।

লটি ! তার নাম ছিলো লটি সোলর্স। সত্যি, এমন দুর্দান্তরকমের সুন্দর নাম আর হয় না। নামটা তাকে মানিয়েছিলোও বটে। ওর ভাইটা, মানে ওই লিউকটা ছিলো একটা কাঠ-ঠোকরা ! অমন রসকষহীন মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। লটি ছিলো লিউকের সম্পূর্ণ উল্টো। দিবারাত্র রসে বসে আছে। ওর চলায় বলায়—সব কিছুতেই একটা শান্ত সৌন্দর্য—এক ধরনের লাবণ্য চোখে পড়তো। ওর চোখ দুটো যেন কথা বলতো। দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে ধারণা করাও অসম্ভব যে তারা দুই ভাইবোন। লিউক লোকটা ছিলো পিউরিটান। কিন্তু লটির মতে, ওর বন্ধুত্বের তুলনা হয়না। ও নাকি আমার সত্যিকার বন্ধু ছিলো। কথা প্রসঙ্গে আমি লিউক সম্পর্কে এমন একটা খারাপ মন্তব্য করলাম যে আমার স্ত্রী হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠলো। যেমন তেমন ফোঁপানো নয়—একেবারে মৃগি রোগীর মতো। আর ফোঁপানির নীট ফল দাঁড়ালো এই, আমার খিদে বেড়ে গেলো অনেক গুণ। ব্রেক ফাস্টের আগে এরকম নাকী কান্না আমার কাছে মনে হলো অসহনীয়। আমি একা একাই নিচে নেমে গিয়ে জম্পেশ্ করে নাশ্তা সারলাম।

কী আর এমন মহা-মন্তব্য করেছি আমি ! এতে অমন অপেরার নায়িকার মতো বিলাপ করার কি আছে ? কথাটা ভেবে আমি একা একাই হাসতে শুরু করলাম। আমি লিউকের কাছ থেকে দেড়শো ডলার ধার নিয়েছিলাম। তার অঙ্কা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেছে। কথাটি ছিলো এই ! হা হা।

কফিনের পাশে ফুলের স্তবক হাতে নিয়ে দাঁড়ানো বিকলাঙ্গ ম্যাক্সি স্ক্যানডিগের শোকাকুল মুখও আমার মনে পড়ছিলো। অনেকেই আমার এই হাসিকে নিষ্ঠুরতা বলে মনে করতে পারেন। কিন্তু কি জানি কেন এই সব কথা মনে পড়ায় আমার দম ফেটে হাসি আসছিলো। ম্যাক্সিকে আমার ভালো লাগতো আসলে ওর বোন রীটার জন্যে। আমি প্রায়ই ম্যাক্সিকে আমাদের বাসায় দাওয়াত করতাম—যা দেখে রীটা ভাবতো, ওর ভাইটাকে কতোই না আদর করি আমি। আসলে ওকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসাটা ছিলো আনন্দ-দায়ক। খাওয়াটা যা উপভোগ্য আর জম জমাট হয়ে উঠতো! ওহ ভাবা যায়না। মনে হতো একটা শিম্পাঞ্জি বসে আছে আমাদের পাশে। ছোকরা কথাও বলতো যেন অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতোই। কিন্তু ওই গুমোর কথা ওরা ভাই বোন কেউই বুঝতে পারেনি কোনোদিন।

ছয়

চমৎকার ছিলো রোববারটা। আমি ভাবছিলাম, কোথায় যাওয়া যায়! কেননা পকেটের অবস্থা খুবই করুণ। অবশ্য কাছাকাছি এর-কম বেশ কয়েকটা জায়গায় আমি যেতে পারি, যেখানে কিছু না কিছু মিলবেই। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাকা নেবার সময় যে দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বক্তৃতা গিলতে হয় তা সত্যি অসহ্য! শিল্প,

ধর্ম, রাজনীতি কোনো প্রসঙ্গই বাদ যায় না সে বাক্যালাপ থেকে। যেতে পারি ট্রেলিগ্রাফ কোম্পানির পুঁচকে শাখা-অফিস গুলোতেও। কাজ না থাকে বন্ধুত্বপূর্ণ-পরিদর্শনের ছুতোনাতা তুলেই না হয় যাওয়া গেলো। সেখান থেকেও বেশ কিছু আমদানী হতে পারে। কিন্তু ভ্যাজর ভ্যাজরের ভয় আছে সেখানেও। সেখানকার আলাপ আরো পচা। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো ইচঁড়ে পাকা কার্লির কথা। আমার কম বয়সী বন্ধুদের মধ্যমণি কার্লি। থাকে হার্লেমে। তা ওকে পাকড়াও করলে কেমন হয়? ওর কাছে টাকা যদি না-ও থাকে, তো মায়ের পার্স থেকে তুলে নেবে। আমার খুব ন্যাওটা। খুবই নির্ভরযোগ্য সে। আমার সঙ্গে প্রায় ছায়ার মতোই লেগে থাকতে চায় আমি জানি। কিন্তু নেহাৎ ছেলে মানুষ বলে সবার আগে বাড়িতে চলে যেতে বলি ওকে। আমাদের আড্ডায় বেশিক্ষণ থাকতে দেই না কোনদিন। বিশেষ বিশেষ সময়ে ওকে সঙ্গে রাখতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে আমার।

ছোকরা একটু গোঁয়ার টাইপের। লাজ লজ্জা কিংবা ভয়ের কোনো বালাই নেই তার মধ্যে। যখন আমার কাছে চাকরির জন্যে আসে, তখন ওর বয়েস মোটে চৌদ্দ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ওর মা বাবা ওকে নিউ ইয়র্কে খালার কাছে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য লেখা পড়া করবে। কিন্তু খালাটি তাঁর বোনপোকে এমন শিক্ষা দান করলেন, অল্পদিনেই ছোড়াটা ঝুনো নারকেল। আর ওর মা বাবাকেও বলিহারি—চাকরি করে কানিভালের দলে। এমন চরিত্রহীন চাকরি

সংসারে আর ক'টা আছে। আজ এখানে কাল ওখানে পরশু সেই খানে পড়ে ওদের তাঁবু। জন্মের পর পরই অমন উড়নচণ্ডী মাবাবার সঙ্গে ভবঘুরেপনা করে কালি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো কাঁচা থাকতেই। খালাম্মা কেবল ওই কাঁচা মাটির পুতুলের গায়ে রঙের পোচ লাগালেন!

ওর বাপ ব্যাটা মাঝেমধ্যেই জেল খাটতো। ওর পড়াশোনা একদম হয়নি। তার ওপর ও শুনতে পেয়েছে—লোকটা নাকি সত্যিকার ভাবে ওর বাপ ও নয়! তাহলে? যাই হোক, কালি যখন আমার কাছে এসে কাজ চাইলো, তখন কেবল কাজ নয় ওর একজন সত্যিকার বন্ধুরও দরকার ছিলো। আমি ওকে নিয়ে নিলাম। পরে অবশ্য দেখি, অফিসের অনেকেই ওকে পছন্দ করছে। বিশেষ করে মেয়েরা! আস্তে আস্তে কালি পরিণত হলো অফিসের পোষা পাখিতে। কিছুদিন পর আমি টের পেয়ে গেলাম, ও একটা চতুর অপরাধীতেও রূপান্তরিত হয়েছে। ওকে আমি ভালোবাসতাম ঠিকই। কিন্তু কখনো বিশ্বাস করিনি। ও আমার জন্যে যেমন জান দিয়ে দিতে তৈরী ছিলো, তেমনি আমার সঙ্গে বেঈমানী করতেও দ্বিধা করতো না তিলমাত্র। তবে হ্যাঁ, সব ব্যাপারেই ও আমার কাছে ছিলো অকপট।

ওর পেটে কথা থাকতো না। যেমন একদিন গড় গড় করে আউড়ে গেলো সোফির কথা, মানে ওর খালাম্মার গোপন কথা! সে নির্বিকারে বলে গেলো মহিলা তাকে কি ভাবে কু-পথে নিয়ে গেলো, তার আদ্যোপান্ত। সোফির যে বিদঘুটে অভ্যাসটা ছিলো তা-ও

জানা গেলো ওর মুখেই। সোফি ওকে যখন পড়াতে বসাতো তখনই নাকি চলতো ওসব আকাম কুকাম। আমার এখানে কাজে লাগবার কিছুদিন পরই কালি আমাকে ওর খালার কাছে নিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব দিলো। কেবল তাই নয়। ছেলেটা এতোই পেকে গিয়েছিলো যে সবকিছু ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে সোফির কাছ থেকে টাকাটা আনাটা আদায় করতো যখন তখন।

চমৎকার দেখতে শুনতে.ছেলেটা। ঠিক যেন দেবদূত। তোমার জন্যে কুকুরের মতো খাটবে। আবার বলা নেই কওয়া নেই, হুম করে হঠাৎ এরকম একটা নিষ্ঠুর কাজ করে বসবে, যা তুমি কল্পনাও করতে পারোনি।

ও ছিলো খেঁক শেয়ালের মতো চালক আর পাতি শেয়ালের মতো হৃদয়হীন। ভ্যালেসকার চাচাতো বোনটার সঙ্গে নাকি তলে তলে বেশ জমিয়ে বসেছিলো ছোকরা। মেয়েটাকে নাকি ওর ভালো লেগেছিলো তার নরম পুষির জন্যে। কিন্তু সমকামী বলে মেয়েটাকে ও একদম বরদাস্ত করতে পারে না। আরো অনেক মেয়েই পিছু লেগেছিলো কার্লির। আর কালিও চালিয়ে যাচ্ছিলো তার ফলাও কারবার। সে বলতো, খালাই তো আমাকে শিখিয়েছে এসব। আমার এ অবস্থার জন্যে ও-ই দায়ী। বদামিটা তো ওর ইশকুলেই শিখেছি! বাপের কথাতো শুনতেই পারেনা কালি। বলে, কুত্তার বাচ্চাকে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। মুক্তোর নক্‌শা অলা হাতলের একটা ক্ষুদে রিভলভারও সে আমাকে দেখালো। কিন্তু এটা দিয়ে ও কাকে মারবে? ওই বুড়ো শয়তানটাকে

কুপোকাৎ করার ব্যাপারে আগ্নেয়াস্ত্র খুবই নমনীয় হাতিয়ার। ওকে মারা উচিত ডায়নামাইট ছুড়ে!

আমি কালির এই মানসিকতার কথা বারবার চিন্তা করেছি। ছেলেটা ওর বাবার ওপর এমন মারমুখো হয়ে আছে কেন? পরে অবশ্য এর ভেতরকার রহস্য ও আমি জানতে পেরেছি। ও ছিলো, যাকে বলে ওর মায়ের আঁচল ধরা পুত্র। বিটকেল্ল বুড়োটা ওর মায়ের পাশে শুচ্ছে-এটা ও আদপেই সহ্য করতে পারতো না। কালির বক্তব্য, ওরাই তাকে ভবঘুরে বানিয়েছে। ওরাই প্রথম শিখিয়েছে কীভাবে মানুষকে প্রতারণা করতে হয়। একটা বাচ্চাকে কেউ এভাবে বেড়ে উঠতে দেয়?

কালির ওখানে গেলাম। সব শুনে ও বুদ্ধি দিলো, অফিসে যেতে। তার মতলব হচ্ছে, অফিসে যখন ও টুকটাক কাজ করবে তখন আমি বাক্যালাপে ব্যস্ত রাখবো ম্যানেজারকে। সেই ফাঁকে কালি যাবে ওয়ার্ডরোবের কাছে—খুচরো পয়সাগুলো হাতিয়ে নিতে। আমি সুযোগ নিতে যদি ঘাবড়ে না যাই, তাহলে সে ক্যাশ-ড্রয়ারের ঝুঁকি নিতেও পেছপা হবে না। ওর ফন্দির ফিরিস্তি শুনে আমি তো হাঁ! বলে কি ছোকরা? ও যুক্তি দিলো—ওরা আমাদের কখ্খনো সন্দেহ করবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কাজ সে আগেও করেছে কিনা!

ঃ অবশ্যই! কালির তড়িৎ-জবাব। সে জানালো, এই কাজ সে বহুবার করেছে খোদ ম্যানেজারের নাকের ডগায়। এবং ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি! হিসবের গোলমালের ঘটনা

অফিসে তোলপাড় জাগিয়েছে। এবং জনা কয়েক নিরীহ নির্দোষ কেরানীর চাকরিও গেছে।

ঃ সোফির কাছ থেকে মানে, তোমার খালাম্মার কাছ থেকে কিছু ধার আনলে কেমন হয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ঃ ধুৎ। মুখ বাঁকালো কার্লি। বললো, ওর কাছে যেতে আমার ঘেন্না করে। যা নোংরা! নিয়মিত গোসল করে না। দিন দিন যেমন মুটকী হচ্ছে, তেমনি তেলতেলে আর তাই নিয়ে ওর কি ফুটানি? জঘন্য! ওর কাছে যাওয়া আর শূকরী পাশে নিয়ে শোয়া একই কথা। মা তো দু'চোখে দেখতে পারেনা ওকে। তার ধারণা সে বাবাকে ভজাবার তালে আছে। ওকে দিয়ে তা সম্ভবও। তবে না, বুড়ো অন্য তালে আছে। একদিন রাত্রে তো হাতে নাতেই ধরা পড়ে গেলো বুড়ো আমার কাছে! সিনেমা হলের ভেতর একটা কম বয়েসী মেয়ের সঙ্গে বাবা ফষ্টিনষ্টি করছিলো। অ্যাজটর হোটেলের মাল—আমি দেখেই চিনলাম। বাবা লোকটা, সত্যি, যাচ্ছে তাই মানুষ। নির্ঘাত একটা কুত্তার বাচ্চা!

শেষ অব্দি কার্লিকে সঙ্গে নিয়ে আমি গেলাম লটিদের বাড়িতে। গিয়ে দেখি, মুখ ভার করে সেখানে বসে আছে ম্যাক্সিও। দমে গেলাম। আমি চেয়েছিলাম লটির সঙ্গে একান্তে কথা বলবো। এমন কি সেখানে কার্লিও থাকবে না। কিন্তু বাইরের ঘরে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে মুশ্‌কোম্যাক্সি। হঠাৎ করে তার উঠে পড়বার কোনো সম্ভাবনাই দেখছিনা। অগত্যা, ম্যাক্সির দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে

বললাম, আমাদের কথা কি পাশের ঘর থেকে শোনা যাবে ? কথাটা সে ভালোভাবে আঁচ করতে পারলো না। তখন আমি বললাম—দ্যাখো, আমি এখানে আসলে এসেছি তোমার কাছেই। কয়েকটা টাকা ধার করতে।

সে আমার দিকে ওরাং উটানের মতো তাকালো। আমি বললাম, জানি, ব্যাপারটা তোমার কাছে অস্বস্তিকর—উদ্ভট মনে হবে। কেননা এ অবস্থায় কারো কাছে টাকা ধার চাওয়া—কিন্তু তুমি হয়তো বুঝতে পারবে কতোটা বেকায়দায় পড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি।

ম্যাক্সি মাথা ঝাঁকালো। তার মুখটা ইংরেজী 'ও' হরফের মতো হতে না হতেই আমি বলালম—দ্যাখো ম্যক্সি, তোমার সার্‌মন শোনার সময় বা মনের অবস্থা এখন আমার নেই। গলাটা আরো খানিকটা নামিয়ে এনে আমি বললাম, তুমি যদি আমার জন্যে সত্যিই কিছু করতে চাও, তাহলে শিগগীর দশটা টাকা দাও। তুমি জানো, লিউক আমার কতো আপন ছিলো। সেদিন টেলি-ফোনে আমি শোক জানাতে পারিনি তোমাকে ঠিকই ; কিন্তু আমার অন্তরটা দুঃখে ভরে গিয়েছিলো। বউটা তো তড়পাচ্ছিলো কাটা কই মাছের মতো। যাই হোক আমি গাড়লের মতো বললাম—টাকাটা ঝটপট দাও। সাংঘাতিক ব্যাপার। কাল তোমাকে সব কথা খুলে বলবো !

ঃ শোনো হেনরী, বললো মাক্সি, পকেট হাত্‌ড়ে সে যেন কি বলতে হবে, তা বের করে আনলো। তোমাকে টাকা দেবো,

এতে আমার মনে করার কি আছে। কিন্তু তুমি কি আমাকে পাকড়াও করার আর জায়গা পেলে না? আমি লিউকের কথা অবশ্য বোঝাচ্ছি না আমি—সে তার সংলাপ সমাপ্ত করার মতো কোনো শব্দ পেলো না।

ঃ যীশুর দোহাই। আমি অধৈর্য গলায় বললাম, ওসব যুক্তি তর্ক পরে হবে। তুমি টাকাটা দাও তো! আমি মরিয়ার মতো হাত বাড়ালাম। ম্যাক্সি এতোটাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো যে একটা বড়ো সড়ো নোট তার মানি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, পকেটেরও অর্ধেকটা বাইরে ঝুলছিলো। টাকাটা সে দেবার আগেই, যেন আমি এক রকম ছিনিয়ে নিলাম। তাকে ভালোভাবে বুঝতেও দিলাম না, নোটটা কতো ডলারের। আমি নিজেও কি দেখেছিলাম তখন, ক' ডলার নিচ্ছি। টাকাটা হাতিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমি স্বাভাবিক ভাবে কিচেনে ঢুকলাম। পরিবারের শোকাকুল সদস্যরা নতমুখে খেতে বসেছিলো। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বললেও আমি ছুতো দেখিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলাম।

বাইরে ল্যাম্প-পোস্টের ধারে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো কালি। আমি ওর হাত ধরে হাঁটা দিলাম। কিছু দূর যাবার পর হাসতে হাসতে আমার অবস্থা কাহিল। যতোবার আমি তাকে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি, ততোবারই দম ফাটা হাসির হামলা। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছে হাসি। এমন হাসি আর জীবনেও আমি হেসেছি কিনা সন্দেহ। মনে হলো, এই হাসি আর কখনো থামবে না। শেষে আমি ঘাবড়েই গেলাম যাহোক!

হাসতে হাসতে শেষটায় মারা যাবো না তো? হাসি থামবার বেশ খানিকটা পরে কালি বললো—কাজ হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে আবার হাসি। এবার আগের চেয়ে প্রবল। আমার পেটে ব্যথা হয়ে গেলো। শেষে একটা রেলিংয়ের ওপর আমার পেট ঠেসে ধরে হাসি থামালাম।

নোটটার ওপর চোখ পড়তেই আমার ফুর্তি দেখে কে? আমার পকেটে এখন বিশ ডলার! পরক্ষণেই আবার একথা ভেবে আমার রাগ হলো যে, ওরকম কতো টাকাই না জানি রয়েছে মাক্সির মতো একটা উজবুকের মানি ব্যাগে। যদি ব্যাটা আমার সঙ্গে বাইরে আসতো এবং ওর পকেটের খবর আমি যদি জানতাম তাহলে ওকে হাইজ্যাক করতেও আটকাতো না আমার। আমি জানিনা, আমার এরকম মনে হলো কেন হঠাৎ। তবে আমি যে খুবই রেগে গেলাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন, এ মুহূর্তের চিন্তা হলো, যতো শিঘ্র সম্ভব কালিকে বাড়ি ফিরতে বাধ্য করা। ওকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বললাম, বৎস, 'এখন কাটিয়া পড়ো।' একথা বলায় ও মনঃক্ষুন্ন হলো বুঝতে পারলাম আমি। বেচারা আমার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলো। টাকাটা নেবার সময় এমন ভাব করলো, যেন, 'কি দরকার ছিলো!' কিন্তু মুহূর্তে আবার তা ছোঁ মেরে তুলে নিতেও সে দ্বিধা করলো না। কেননা ওর দোনামনা দেখে টাকা পাঁচটা আমি নিজের পকেটে চালান করার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। এবং আমার ভাবান্তর ওর নজর এড়ায় নি।

কালি চলে যেতেই ভাবলাম, আপদ গেছে। ভাবলাম, এখন

আমার দরকার একটা নোংরা মেয়েলোক। আক্ষরিক অর্থেই সে হবে নোংরা। সৌন্দর্যের লেশ মাত্র যেন তার মধ্যে না থাকে। কিন্তু সে কোথায়? আমি, কোথায় পাবো তারে?

রাত্রি। আবার সেই নিরর্থক, শূন্য শীতল রাত্রি। নিউ ইয়র্কের যান্ত্রিক রাত্রি। যেখানে শান্তি নেই। আন্তরিকতার আবার প্রত্যাখ্যানও নেই। চারদিকে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে মানুষ। চারদিকে কেবল টাকার কথা। টাকা টাকা এবং টাকা। এ ছাড়া আর কোনো আলোচ্য বিষয় নেই। কিন্তু টাকা বানাবার পদ্ধতিটা বানায় কে?

নৈশ রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কতো কথাই যে মনে হয়। আমদের পুরনো পাড়াটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনা। মনে হয় সেই বিখ্যাত রাইয়ের রুটির কথা। সেই চমৎকার গন্ধ ভরা তেতো রাইয়ের রুটি। খালার মাথার চুলের গন্ধ। আরো কতো বিচিত্র ঘ্রানে ম ম করতো আমাদের রাস্তাটা। ইহুদী দর্জি সিলভার স্টাইনের দোকানটাতে ও ছড়িয়ে থাকতো এক ধরনের অদ্ভুত গন্ধ। এটা তারই গায়ের গন্ধ। ওর টেলারিং হাউসের পাশেই ছিলো ক্যাণ্ডি আর মনোহারি দোকান।

এক ধর্ম প্রানা বুড়ী ছিলো সেই দোকানের মালিক। দোকানটা ভুর ভুর করতো টফি, স্প্যানিস বাদাম আর ক্যাপোরাল সিগারেটের মিষ্টি গন্ধে। স্টেশনারী দোকানটা ছিলো যেন একটা চমৎকার গুহার মতো। সব সময় ঠাণ্ডা। নানা মন-ভোলানো জিনিষে টৈটম্বুর। একদিকে ছিলো আবার সরবতের বন্দোবস্ত।

বিশেষ করে গরমের দিনে এই জায়গাটা লেমোনেড আর আইস-ক্রিমের গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠতো!

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আমার ঘ্রাণের অনুভূতিও পরিবর্তিত হয়েছে। ইদানীং যোনির গন্ধ ছাড়া কোনো কিছুকেই আর প্রিয় মনে হয় না আমার। বিশেষ করে মেয়েমানুষের সঙ্গে খেলা করে উঠে আঙুলের আগায় যে আঠালো জিনিসটা লেগে থাকে, তার গন্ধের তো তুলনাই হয়না। মেয়েদের স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকে মানুষের। কিন্তু তার যোনির গন্ধ সে বেমালুম ভুলে যায় কেন? আবার তার ভিজে চুলের গন্ধই বা চিরদিন জেগে থাকে কীভাবে! এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

আশ্চর্য! আজ চল্লিশ বছর পরেও আমার খালা তিল্লির শ্যাম্পু করা চুলের গন্ধ মনে আছে পরিস্কার। খালা তার চুল শ্যাম্পু করতো রান্নাঘরে—যে ঘরটা সব সময় তেতে থাকতো অসহ্য তাপে। সাধারণত সে শনিবার বিকেলেই কেশ বিন্যাস করতো নাচের আসরে যাবার জন্যে। সেখানে চমৎকার হলদে ডোরাকাটা পোষাক পরা এক সার্জেন্ট যে তার জন্যে অপেক্ষা করবে, তা-ও জানতাম আমি। সার্জেন্টটার চেহারা যা সুন্দর ছিলো! আমি গর্ব অনুভব করতাম যে আমার খালা এরকম একজন রূপবান মানুষের প্রেমিকা! আমাদের গোসলখানার পাশেই ছিলো একটা জানালা। সেখান থেকে আমি বাইরের তুষার পাত দেখতাম নিরানন্দ ও শূন্য দৃষ্টিতে। ভেতরে শোনা যেতো পানি গড়াবার শব্দ—আমার মা পায়খানায় বসেছে। বাড়ির

কনফারেন্স-রুম ছিলো রান্না ঘরটা। বাড়িতে একটা কিছু ঘটলেই সবাই ছুটে যেতো পাকঘরে। তারপর কানাকানি টারিটুরি, গুজ গুজ-ফুসফুস। সে সভায় অবশ্য আমার প্রবেশাধিকার ছিলোনা। হয়তো রান্নাঘরে কোনো গোপন বৈঠক চলেছে। এমন সময় এলো কোন আত্মীয় বা পাড়া পড়শি। ব্যাস্। সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন। সবকিছু আবার ঠিকঠাক। আবার স্বাভাবিক। একটু আগেই যে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনা-সভা চলছিলো, তার চিহ্নমাত্র নেই।

ফাদার ক্যারলের সেই পালক ছেলেটার কথা মনে পড়ে যায়। ছেলেটা বয়েসে ছিলো আমাদের চেয়ে বড়ো। অপূর্ব সুন্দর দেখতে। অনেকটা মেয়েলী। বিশেষ করে ওর হাঁটার ঢঙ দেখে আমার মেজাজ খিঁচড়ে যেতো। একদিন পাড়ার ছেলেরা মিলে ওঁৎ পেতে ছিলাম গলির ধারে। যেই নাকি ছোড়াটা কাছাকাছি এসেছে, অমনি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ওপর। তারপর পাইকারি পিটুনি। যে পর্যন্ত সে ভ্যাঁ করে কেঁদে না-ফেললো, সে পর্যন্ত থামলাম না আমরা! কিল গুঁতো থামালেও রাস্তার ওপর উপুর করে ধরে তার পাছার কাপড় ছিঁড়ে দিলাম। কী জঘন্য কাজ! অথচ আমরা যেন তাতে বিমল আনন্দ পেয়েছিলাম। একইভাবে আমরা পেছনে লেগেছিলাম এক চীনা ম্যানের। রাস্তার ধারে ছিলো তার লণ্ড্রী। লোকটাকে দেখতে মনে হতো ঠিক ইশকুলের বইয়ে আঁকা কুলির ছবির মতো। সে পরতো কালো আলপাকার এক কিম্ভুত কোট। কী বিশাল একগুচ্ছ বোতাম ছিলো সেই বাহারী জামার! তার চটির কোনো হীল ছিলো না। মাথায়

ছিলো মস্ত টিকি। সে যখন হেঁটে যেতো, তার হাত দুটো থাকতো ঝলঝলে হাতার ভেতরে লুকোনো। মেয়েদের মতো তার সেই হেঁটে যাওয়া আমাদের কাছে ছিলো যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি অচেনা। তাকে আমরা ঘেন্না করতাম ওই সমস্ত কারণেই। কিন্তু আমরা যে ওকে অপছন্দ করি, তা ওর চোখে আঙুল দিয়ে কীভাবে বোঝানো যায়? আমরা লোকটাকে অপমান করার মওকা খুঁজতে লাগলাম।

একদিন আমরা তার লণ্ড্রীতে গিয়েছি। সে যথারীতি কাপড়ের প্যাকেট দিলো। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে কাউন্টারের নীচে রাখা ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু লিচু বের করে সবাইকে খেতে দিলো। তার মুখে নির্মল হাসি। এবং আশ্চর্য—সে ওই রকম হাসতে হাসতেই কান চেপে ধরলো অ্যালফির। তারপর পর্যায় ক্রমে আমাদের সবার কানই সে হাসতে হাসতে মলে দিলো। হঠাৎ চাপা গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালের মতো চট্ করে কোত্থেকে বের করে নিয়ে এলো একটা বিদঘুটে দেখতে লম্বা ছুরি। তারপর ওটা উঁচু করে ধরে আমাদের দিকে দৌড় দিলো। আমরা সঙ্গে সঙ্গে লণ্ড্রী থেকে বেরিয়ে—সে কি দৌড়! রাস্তার ওপারে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেখি, মনোযোগের সঙ্গে কাপড়ের ওপর ইস্ত্রি চালাচ্ছে চীনা ম্যানটা। শান্ত, নির্বিকার, স্বাভাবিক। এই দুর্ঘটনার পর আমরা আর লণ্ড্রীর ছায়াও মাড়াতাম না। ফলঅলার ছেলে লুই পাইরোসাকে পয়সা দিয়ে সবাই কাপড় আনাতাম লণ্ড্রী থেকে। লুইয়ের বাবা ফল বেচতো রাস্তার ধারে বসে। সে মাঝেমধ্যে

আমাদের আদর করে খেতে দিতো পচে যাওয়া কলা। ওই পচা কলার বিশেষ ভক্ত ছিলো ষ্ট্যানলি। ওর চাচী আবার ওকে সেই পচা কলা ভেজে দিতো। পচা কলা ভাজা পরিণত হয়েছিলো ও বাড়ির প্রিয় খাদ্যে।

একবার ষ্ট্যানলির জন্মদিন। পাড়ার সবাইকে দাওয়াত করা হয়েছে। সবকিছু ভালোভাবেই চলছিলো। তবে গোল বাঁধলো ভাজা পর্যন্ত এসেই। পচা কলা ভাজা কেউ মুখে তুলবে না। শুরু হলো হৈ হট্টগোল, হাসাহাসি। শেষে কার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে যেন একটা বুদ্ধি বেরিয়ে এলো। বুদ্ধিটা হলো ওই কলা ভাজা খেতে দেয়া হবে উইলি মেইনকে!

উইলি বয়েসে আমাদের সব্বার বড়ো। কিন্তু বোবা। সে সর্ব সাকুল্যে একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। শব্দটা হলো —বজোর্ক! সুতরাং ভাজা কলার স্তূপটা তার সামনে রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে গর্জে উঠলো—বজোর্ক! এবং মুহূর্তের মধ্যে দু'হাত মেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডিশের ওপর। কিন্তু জর্জও উপস্থিত ছিলো। উইলির ভাই জর্জ। ব্যাপার দেখে সে মনে করলো, তার পাগলা ভাইটাকে ভাজা কলা দিয়ে আপ্যায়িত করে আসলে তাকেই অপমান করা হচ্ছে! আর তাই সে মারমুখো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছি আমরাও। ভাইকে আক্রান্ত হতে দেখে বোবা উইলি এগিয়ে এলো ঘুষি বাগিয়ে। ভাইকে ঘুঁষিচালাচ্ছিলো সাহায্য করবার ইচ্ছায়। সে প্রাণ পণে এলোমেলো আর মুখ দিয়ে শব্দ করছিলো-বজোর্ক! বজোর্ক! বজোর্ক!…

তার হামলার মুখে কেবল ছেলেরা নয়—মেয়েরাও পড়লো। সে এক তুলকালাম কাণ্ড। স্ট্যানলির বাবা গোলমাল শুনে ছুটে এলো তার হেয়ার-কাটিং সেলুন থেকে। সে উইলির গলায় স্কার্ফ বেঁধে তাকে বিরত করলো। ব্যাপার দেখে জর্জ গিয়ে ডেকে আনলো ওর বাপকে। বুড়ো মদ খেয়ে টং। নাপিতের হাতে ছেলে লাঞ্ছিত হয়েছে শুনে ক্ষেপে গেছে সে। লাঠি নিয়ে ছুটে এলো স্ট্যানলির বাবার দিকে। এবং দমাদ্দম পিটুনি। ইস রে—সে কি মার!

সাত

উইলির অবস্থা তো, যাকে বলে সাংঘাতিক। তার মুখ হাত পা মাথা পেট পিঠ সবকিছু কলায় ছয়লাপ। কলায় মাখামাখি মেঝের ওপর সে বার বার আছড়ে পড়ছিলো। আর ছাগলের মতো চপ চপ করে সেই কলা খাচ্ছিলো উবু হয়ে। পুত্র রত্নের কীর্তি দেখে মাতাল বুড়ো রাগে কাঁই হয়ে ছুটে গেলো তার দিকে। এখন উইলির মুখে শুরু হলো আবার সেই বিদঘুটে আওয়াজ—বজোর্ক বজোর্ক। হাসির হররা উঠলো এবার সারা ঘরে।

হাসির ভেতর দিয়েই শেষে কেটে গেলো মিঃ মেইনের সমস্ত রাগ। তিনি একটি চেয়ারে বসলেন এবং স্ট্যানলির চাচী তাকে

এক গ্লাস মদ এনে দিলো। ওদিকে হৈ হল্লা শুনে পাড়ার সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়িতে। ফলে টেবিলে টেবিলে এলো আরো মদ, আরো খাবার। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই খুশিতে সবাই নাচ গান শুরু করে দিলো। সেই সঙ্গে তীব্র শিস্। এমনকি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও মদ খেয়ে মাত্‌লামোর ভান করে সে কি পরিত্রাহি চীৎকার! ওহ সে যেন এক কুরুক্ষেত্র! ওদিকে সবার দেখাদেখি মদ খেয়েছে হাবা উইলিও। তার বজোর্ক-বজোর্ক হুংকারও তাই তুঙ্গে এখন। অনেকখানি মদ গিলে ফেলেছে আট বছরের অ্যালফি পর্যন্ত—এবং সে সুযোগ পেয়ে উইলি মেইনকে পেটাতে শুরু করেছে। রুখে দাঁড়িয়েছে উইলিও। তারপর আমরা সবাই শুরু করলাম গুঁতোগুঁতি। বড়োরা আর কি করবে। হো হো করে প্রাণ খোলা হাসি হেসে তারা একজন আরেকজনের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো! শুরু হলো আরো হাসি তামাশা। টেবিলে টেবিলে এলো আরো পচা কলা। সবাই গপাগপ গিললো সেই অপরূপ সুখাদ্য। এমন সফল, সুন্দর জন্মদিন আমি কখনো দেখিনি!

সাতদিন যাবৎ সারা এলাকায় ওই কলাভাজার গল্প ছাড়া আর কোনো প্রসঙ্গই নাক গলাতে পারেনি। অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো যে, পাড়ার সবাই হয়ে পড়লো ভাজা কলার ভক্ত। কিন্তু লুই পাইরোসার বুড়ো বাপ আর কতো পচা কলার যোগান দেবে! যাহোক, পচা কলার চাহিদা অস্বাভাবিক বেড়ে গেলো সারা তল্লাটে।

এর পরেই পাড়ায় ঘটলো এক সাংঘাতিক ঘটনা। জোয়েসিল-ভারস্টাইনের হাতে মার খেলো জো গেরহার্ড। সিলভারস্টাইন দর্জির ছেলে। বয়েস পনেরো কি ষোলো। স্বভাবে শান্ত। বেশ পড়ুয়াও। একদিন কাপড় ডেলিভারী দিতে ফিলামোর প্লেসে গেছে। এমন সময় তার ওপর হামলা করলো গেরহার্ড। বয়েসে দুজনেই প্রায় সমান। গেরহার্ডের ধারণা, সেইই বেশী শক্তি শালী। প্রথমে কথা কাটাকাটি। তারপর হঠাৎ সে সিলভারস্টাইনের কাপড়ের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে রাস্তার পাশে জমে থাকা জঞ্জালের মধ্যে ফেলে দিলো। কেউ ভাবেনি, যে শান্ত সুবোধ ইহুদির ছেলে সিলভারস্টাইন এর এমন একটা দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে। প্রচণ্ড মার দিলো সে গেরহার্ডকে। চোয়াল ফুলে উঠলো গেরহার্ডের, ঘুসির পর ঘুসি খেয়ে। বিশ মিনিট লাগাতার পিটুনি খাবার পর পথের ওপর শুয়ে রইলো সে। উঠে দাঁড়াবার শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই তার শরীরে। আমরা তো ভয়ে সিটিয়ে অনেকটা তফাতে সরে গিয়ে রীতিমতো কাঁপছি।

আর সিলভারস্টাইন তার গায়ের ধূলো ঝেড়ে, যেন কিছুই হয়নি এরকম ভঙ্গীতে কাপড়ের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে গদাই লস্করী চালে চলে গেলো বাপের দোকানের দিকে। কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারলো না। চারদিকে টি-টিক্কার পড়ে গেলো। ছি ছি ছি। এ বলে কি! এরকম অঘটনের কথা কে কবে শুনেছে! ইহুদীর হাতে ভদ্দর লোকের ছেলে এমন অপমানিত আর কবে হয়েছে। এ যে বিশ্বাস করাও দুস্কর। কিন্তু ঘটনাটি ঘটেছে প্রকাশ্য দিবা-

লোকে। বহু লোকের চোখের ওপর, নাকের ডগায়।

আমরা রাতের পর রাত এ নিয়ে আলাপ করেছি। কি করা যায়, সে ব্যাপারে আলোচনা শুরু হয়েছে অনেক বার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারিনি। অবশেষে জো গেরহার্টের ছোট ভাইটা সমস্যা সমাধানের ভারটা নিজের হাতে তুলে নিলো। জানি যদিও জো-র চেয়ে বয়েস এবং আকারে ছোট ; কিন্তু সে ছিলো মূলত : একটা পুঁচকে চিতাবাঘ। সে সিলভারস্টাইনকে বাগে পাবার জন্যে প্রায়শঃ ওৎ পেতে থাকতো। একদিন পেয়েও গেলো সামনা সামনি। জনির পকেটে ছিলো বেশ পুরুষ্ট দুটি পাথর। সিলভারস্টাইন তার সামনাসামনি হতেই সে ওর কপাল লক্ষ্য করে পাথর দুটো ছুঁড়ে মারলো সজোরে। সিলভারস্টাইন নিঃশব্দে বসে পড়লো মাথাটা চেপে ধরে। রুখে দাঁড়াবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তার মধ্যে আর দেখা গেলো না। একটু পর সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। জনি ঘাবড়ে গেলো এবং পাঁই পাঁই করে ছুটে পালালো সেখান থেকে। সেই যে গেলো, আর তার পাত্তা নেই।

পরে শোনা গেলো, জনিকে কোথাকার এক কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে। ওর মা নাকি বলেছে, জীবনে তাকে যেন আর অমন কুপুত্রের মুখ দর্শন করতে না হয়। ওদিকে আস্তে আস্তে সেরে উঠলো সিলভারস্টাইনও। কিন্তু শরীরের আগের অবস্থা সে আর কখনো ফিরে পায়নি। লোকে বলাবলি করতো, আঘাতটা তার মস্তিষ্কের ক্ষতি করেছে। এদিকে জো-গেরহার্ড

আবার উঠে এলো তার পুরনো প্রতিষ্ঠায়। এও দেখা গেলো যে, শয্যাগত সিলভারস্টানইকে সে দেখতে গেছে এবং দুহাত ধরে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। এরকম ঘটনার কথা কেউ কখনো শোনেনি এ এলাকায়। এই ঘটনার পর জো-গেরহার্ডকেই পাড়ার একমাত্র ভদ্রলোক বলে মনে হতে লাগলো!

অবশ্য ভদ্রলোক—এই শব্দটি কখনো উচ্চারিত হতো না মহল্লায়। হবার দরকারও ছিলো না। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনার পর শব্দটি সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। এবং গেরহার্ডের ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটাই যে ভদ্র হবার অন্যতম মাপকাঠি, তা বিবেচনা করতেও কারো দেরী হয়নি। পরাজিত জো-এর ভদ্রলোকে রূপান্তরিত হবার এই প্রক্রিয়া আমার অনুভূতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছিলো। ক'বছর পর আমি যখন অন্য পাড়ায় গোলাম, ক্লদ দ্য লেঁারেই নামে একটি ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়। আমি তাকেও ভদ্রলোক বলে মেনে নিতে দেরী করিনি। সত্যি, এরকম ছেলে সহজে কারো চোখে পড়ে না। ওকে আগের পাড়ার ছেলেরা দেখলে নির্ঘাত মেয়েলী বলে ক্ষেপাতো। তার কারণ সে শুদ্ধ ভাষায়, চমৎকার উচ্চারণে আর অতি নম্রভাবে কথা বলতো। আর এক কারণ তার বিশুদ্ধ বিবেচনা বোধ আর ভদ্রতা। আমাদের সঙ্গে খেলাধুলো করার সময় হঠাৎ যদি তার মা বাবা এদিকটায় এসে পড়তো তখন সে আকস্মিকভাবে ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুরু করতো। ব্যাপারটা আমাদের কাছে ছিলো আঘাত স্বরূপ।

আমরা জার্মান ভাষা শুনেছি আগেই। এই ভাষায় কথা বলাকে

উল্লেখ করা যায় অনুমোদন যোগ্য-অপরাধ হিসেবে। কিন্তু ফরাসী? ভাষাটার মধ্যে রয়ে গেছে এক ধরনের আভিজাত্য ও বিচ্ছিন্নতা। পচন তো অবশ্যই। ক্লদ আমাদের প্রিয় বন্ধু। আমাদের সবার চেয়ে সব বিষয়ে কিঞ্চিৎ ভালো। কিন্তু তার ভাষা? এটাই ছিলো আমাদের কাছে বিশেষভাবে আপত্তিকর। ওর ভাষা শুনলে মনে হতো এ তল্লাটে থাকবার কোনো অধিকার ওর নেই। ওরকম যোগ্য হওয়ার যোগ্যও যেন সে নয়।

ওর মা ওকে নিয়ে চলে যাবার পর আমরা লোঁরেই-পরিবারের নানা বিষয় নিয়ে গুরুতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতাম। ওরা, আমাদের কাছে ছিলো এক কথায় রহস্যময়! আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতো, ওরা কি খায়? ওরা যেহেতু আমাদের থেকে আলাদা; ওদের আচার বিচারও তো আমাদের থেকে অন্য রকমহওয়াই সম্ভব। কখনো কোনো বাইরের লোক কেন ওদের বাড়িতে যায়না—এটাও ছিলো এক সন্দেহজনক ব্যাপার। কেন যায়না? এই প্রশ্নটা আমাদের মনে খালি ঘুরপাক খেতো। তারা কি তাহলে আত্মগোপন করে আছে?

যদিও রাস্তায় বেরুলে তাদের মনে হতো যথেষ্ট মিশুক। মুখে হাসি লেগেই আছে। আর কথাবার্তা? তা ইংরেজিতে তো বটেই। এবং চমৎকার ইংরেজিতে। তখন যেন আমরা লজ্জায়, হীনমন্যতায় কুঁকড়ে যেতাম ওদের শ্রেষ্ঠত্বে, ওদের উজ্জলতায়। ব্যবধান আরো একটা ছিলো। আমরা নিজেদের মধ্যে সরাসরি প্রশ্ন ও উত্তরে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু ক্লদকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস

করলে সে সোজাসুজি তার জবাব দিতো না কখনো। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সে উত্তর দিতো সব সময়। আর কথার জবাব দেবার আগে সে সুন্দর করে একটু হাসতো। তারপর বাছা বাছা শব্দগুলো উচ্চারণ করতো গোছানো ভঙ্গিতে। নম্র নিবিড় কণ্ঠস্বরে। আমরা নিজেরা যা কখনো পারতাম না মূলত ও ছিলো আমাদের পক্ষে একটা কাঁটা যা সব সময় বিঁধতো। একদিন পাড়া ছেড়ে ওরা চলে গেলো। আর আমরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অবশ্য দশ পনেরো বছর পর আমি লেঁারেই পরিবারের ওই সব আশ্চর্য ব্যবহারের কথা চিন্তা করেছি। আমার মনে হয়েছে, আমি ভুল করেছিলাম। একবার ক্লদ আমার কাছে এসে আমার একান্ত বন্ধুত্ব কামনা করেছিলো। আমি ভেবেছিলাম, অন্যদের চেয়ে আমার মধ্যে আলাদা কিছু অনুভব করেই সে এরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো। কিন্তু আমার একটা দুশ্চিন্তা ছিলো যে, তার একার বন্ধুত্বকে বড়ো বলে মনে করলে অন্যদের বন্ধুত্বের প্রতি অবিচার করা হবে।

দীর্ঘ ব্যবধানের পর আমি কয়েক মাসের জন্যে যখন ফ্রান্স যাই, তখন—প্রাসঙ্গিক—এই শব্দটার মর্ম আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। মনে পড়ে, আমাদের পাড়া ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার পর একদিন ক্লদের সঙ্গে আমার দেখা হয় তাদের নতুন বাসার সামনে, রাস্তায়। ক্লদ আমাকে প্রাসঙ্গিক হবার পরামর্শ দিয়েছিলো। এটা এমনি একটা শব্দ, আমার নিত্য—ব্যবহার্য শব্দ, সম্ভারে যার কোনো উপস্থিতি ছিলোনা। এটা আমার কাছে

ভদ্রলোক—এই শব্দের মতোই কিছু একটা, এরকম শব্দ রয়েছে আরো কয়েকটা। যেমন 'সত্যিই'—। জ্যাক লসন আসবার আগে আমি এই শব্দটির ব্যবহারবিধিই জানতাম না। সে প্রায়শ এটি উচ্চারণ করতো, কারণ তার মা বাবা ইংরেজ। 'সত্যিই'—শব্দটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আরো মনে পড়ে যায় আমাদের পুরনো পাড়ার কার্ল রেঞ্জারের কথা। সে ছিলো এক রাজনীতিবিদের ছেলে। ফিলামোর প্লেস নামে আধা অভিজাত এক ছোট্ট রাস্তায় ছিলো ওদের বাড়ি।

রাস্তার একদম শেষে লাল ইটের ছিমছাম বাড়ি। সব সময় ঝকঝকে, পরিপাটি। বাড়িটার কথা আমি ভুলিনি। কেননা ওখান দিয়ে ইকুশলে যাবার সময়, দরজার পেতলের হাতলগুলো কী চকচকে—এই মন্তব্যটা প্রায়শ করতাম আমি। আসলে দরজার হাতল কেউ কখনো পালিশ করেনা। তার দরকারও পড়ে না। যাই হোক, ক্ষুদে কার্ল রেঞ্জার ছিলো এমনি একটি বাড়ির ছেলে, যে বাড়ির কাউকে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেয়া হতোনা।

সত্যি কথা বলতে কি, তাকে খুব কমই দেখা যেতো। সাধারণত: ফি-রোববার ওকে এক ঝলকের মতো দেখতাম ওর বাবার সঙ্গে বেড়াতে। কার্লের বাবা যদি এলাকার একজন প্রভাবশালী লোক না হতেন, ছেলেটা কবে পাথরের ঢিল খেয়ে মরতো। ছেলেটা ওই বয়েসেই লম্বা পাৎলুন পরতো এবং পেটেন্ট লেদারের জুতো পায়ে দিতো। ব্যাপারটা ছিলো অন্যদের

কাছে দৃষ্টিকটু। কেউ কেউ বলতো, ছেলেটা অসুস্থ। সেইজন্যে বাবা মা আদর করে ওই সব শৌখিন পোষাক পরতে দেয় ওকে। অদ্ভুত ব্যাপার এই, আমি কখনো ওকে কোনো কথা বলতে শুনিনি। সে এতোই মার্জিত ছিলো যে প্রকাশ্য বাক্যালাপ সম্ভবত তার রুচিতে বাঁধতো।

রোববার সকালে আমি ওৎ পেতে থাকতাম, কখন কার্ল ওর বাবার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যায়, তা দেখতে। যে রকম মনোযোগ দিয়ে আমি ফায়ার ম্যানকে ফায়ার-হাউসের ইঞ্জিন সাফ করতে দেখতাম, ঠিক তেমনি অভিনিবেশ সহকারে চেয়ে থাকতাম ওর দিকে। সম্ভবতঃ ভোজের শেষে মিষ্টিমুখ করার জন্যেই কার্ল তার হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতো ছোট্টো এক বাক্স আইসক্রিম। ফলে 'মিষ্টি মুখ' শব্দ-বন্ধও আমাদের কাছে বেশ পরিচিত বহুল ব্যবহৃত হয়ে উঠেছিলো। আমারা ভাবতাম, বাপ্‌স, এরা আবার মিষ্টিমুখও করে! বলা বাহুল্য, এ শব্দও আমাদের কাছে আমদানী হয় কার্লদের বাড়ি থেকেই। সে সময় স্যান্টোস ডুমণ্ট নামটাও বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলো। এই নামটা শুনলেই আমাদের চোখের সামনে একজন রহস্যময় পুরুষের ছবি ভেসে উঠতো। তার কীর্তিকলাপ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকার ছিলো না—আমরা বুঝতাম কেবল ওই নামটাই। যা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নাকে আসতো কফি আর চিনির গন্ধ; কিউবান গাছগাছালির ঘ্রাণ। চোখে ভাসতো এক কোনে তারকা-চিহ্নিত কিউবান পতাকা।

আর সুইট ক্যাপারাল সিগারেটের বিচিত্র প্যাকেট। মুলত স্যাণ্টোস এবং ডুমণ্ট—এই দু'টি শব্দই আমাদের কাছে বিদেশী। যেমন চাইনিজ লণ্ড্রী কিংবা লোঁারেই পরিবার।

পরবর্তী সময়ে আমি যেসব জায়গায় গিয়ে কোনো বৈচিত্র বা বৈশিষ্ট খুঁজে পাইনি ছেলেবেলায় সেই সব দেশ নিয়ে কথা বলতাম আমরা। যেমন চীন, পেরু, মিশর, আফ্রিকা, আইসল্যাণ্ড বা গ্রীনল্যাণ্ড। আমার ভূত এবং ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করতাম। বলাবলি করতাম। আত্মার স্থানান্তর, নরক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অদ্ভুত পাখি ও মাছ নিয়ে। কথা বলতাম মূল্যবান পাথরের গঠন সম্পর্কে। রবারচাষ, অত্যাচারের পদ্ধতি অ্যাজটেক ও ইনকা সভ্যতা, নাবিক-জীবন, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, দুনিয়ার নানা অংশে শেষকৃত্য ও বিচার-ব্যবস্থা, ভাষা, আমেরিকাম-ইণ্ডিয়ানদের উৎপত্তি, মোষের মড়ক, অদ্ভুত অসুখ, নরখাদক যাদুকর, চন্দ্র-যাত্রা, খুন, বাইবেলের অলৌকিক বর্ণনা, মৃৎশিল্প এরকম এক হাজার একটা বিষয় নিয়ে অমরা প্যাঁচাল পারতাম। যেসব কথা বাড়িতে বা ইশকুলে কখনো শুনিনি। বড়োরা যা কখনো আমাদের জানান নি বা নিজেরাও জানতেন না!

মানুষ কেন তার প্রতিজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হয়? আমি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি, অদৃশ্য একটা শক্তি একজনের যাবতীয় প্রয়াস প্রচেষ্টাকে নিস্ফল করে দেয়। আমার বাবাও ছিলো ওই ধরনের ব্যর্থ লোকদের একজন। পূর্ণতার মুহূর্তে তার জীবন ছিলো শূন্য। অসুখ হবার আগে বাবা কখনো ধর্মীয় অনুভূতি প্রকাশ

করে নি। আমার মা-ও নয়। মনে হয়, বিয়ের সময় সেই যে দুজন গির্জায় ঢুকেছিলো আর কোনো দিন চার্চের চৌকাঠ মাড়ায়নি। কেউ যদি নিয়মিত যেতো তারা তাদের নিয়ে বরং রসিকতার সুরে বলাবলি করতো,-'অমুকে বেশ ধার্মিক!' যেন ওরা দুজন ওই সব ধর্ম-ভীরু নরনারীর প্রতি করুণা প্রদর্শন করছে।

বাবার স্বাস্থ্য ছিলো ভালো। তবে মদে ক্ষতি করেছিলো। তাছাড়া নানা দুর্বিপাকে ভেতরে ভেতরে সে নিঃশেষ হয়ে আসছিলো। ঋণের পাহাড় জমে গিয়েছিলো পরোপকার নামক মহান ব্রত পালন করতে গিয়ে। এমন কি ক'জন পুরনো বন্ধু ও তাকে কুপোকাৎ করে দেবার মতলব নিয়ে কাল যাপন করছিলেন। বাবাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত করে তোলে আমার মায়ের মনোভাব। সবকিছু মা দেখতো বাঁকা চোখে। যখন তখন ক্ষেপে যেতো সে। অশ্রাব্যভাষায় গালাগাল শুরু করতো। বাসন কোসন ভাঙচুর, ছত্রখান করতো এবং হুমকি দিতো পালিয়ে যাবার। অবশ্য এ ছাড়া তার অন্য কোনো উপায়ও ছিলোনা। কেননা বাবা মদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অসুখ বাড়িয়ে তুলেছিলো।

একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাবা প্রতিজ্ঞা করলো, আর এক ফোঁটাও স্পর্শ করবে না। অবশ্য একথা কেউ বিশ্বাস করলো না। কেননা আমাদের পরিবারে এরকম প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ছিলো বেশ কয়েকজন। তারা অবশ্য চেষ্টা করতো টিটো-টালার হতে। কিন্তু সফল হতো না বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাবা ভেল্কি দেখিয়ে ছাড়লো যাহোক! খোদা জানে, মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখার ওই শক্তি

বুড়ো কোথায় পেয়েছিলো। কিন্তু মা এমন ইডিয়ট ছিলো যে, এই নিয়ে মস্করা করতে শুরু করলো বাবার সঙ্গে। কিন্তু বাবা মদ আর ছুঁলোই না শেষ পর্যন্ত।

কয়েক সপ্তাহ পর বাবা কেমন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লো। তার শরীর দ্রুত ভেঙ্গে গেলো। সে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো হঠাৎ। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থও হয়ে উঠলো ভদ্রলোক। সুস্থ মানে, বিছানা থেকে উঠে একটু খানি হাঁটাচলা করতে পারা আরকি। সম্ভবভ পেটে তার আলসার হয়েছিলো যাতে সে বড্ড কাবু হয়ে পড়ে। পাকস্থলী তার এতো দুর্বল হয়ে পড়ে যে, একবাটি সুপও আর তার হজম হতো না। মোট কথা, তার জীবনী-শক্তি নিঃশেষ হয়ে এলো দ্রুত। কয়েক মাসের মধ্যেই বাবা পরিণত হলো এক জীবন্ত-কঙ্কালে। এবং অথর্ব। তাকে দেখে মনে হতো, ল্যাজারাস উঠে এসেছে কবর থেকে! একদিন অশ্রুসজল চোখে মা আমাকে পাঠিয়ে দিলো পারিবারিক চিকিৎসকের কাছে। তার চোখ মুখে কাতর ভাব। বাবার সত্যি সত্যি কি হয়েছে, ডাক্তারের মুখ থেকে সে তা জানতে চায়। বলা দরকার যে, ডঃ রসচ বহুবছর যাবৎ আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। টিপিক্যাল-ওলন্দাজ। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো বললেই যথাযথ বলা হয়। কেউ তাঁর অফিসে ঢুকলে তিনি মুখ তুলে তাকান না পর্যন্ত। যা করছিলেন বা যা লিখছিলেন তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করেন। আর বিরতিহীন ভাবে নিক্ষেপ করে চলেন প্রশ্নবান। প্রায় প্রতিটি

প্রশ্নই অপমানজনক। তাঁর ধারণা রুগী দেহগতভাবে অসুস্থ, তার চেয়ে অধিক অসুস্থ মানসিকভাবে। "তুমি কেবল এটা কল্পনা করো!" তাঁর প্রিয় বাক্য। মোটকথা, বিদঘুটে এই লোকটার কাছ থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকতেই পছন্দকরতাম আমি। যাই হোক, আমি তাঁর কাছে গেলাম তৈরী হয়েই! এমনকি আমার সঙ্গে ছিলো বাবার মলমূত্রের ল্যাবরেটরী-রিপোর্টও। কেন না, আচমকা এটা চেয়ে বসতে পারে বুড়ো বদ্যিটা!

অথচ এই ডাক্তার ছেলেবেলায় আমাকে কতোই না স্নেহ করতেন। কিন্তু যেদিন আমি হাত তালি দিয়ে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম, সেদিন থেকেই আমাকে দুচোখে দেখতে পারেন না তিনি এই যেমন আজকেও আমাকে দেখেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া! আর আমি আদপেই অবাক হলাম না, যখন তিনি রোগ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করে বললেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তুমি যেতে পারো না! কথাটা যখন তিনি বললেন, তখন মনে হচ্ছিলো না তিনি এ জগতে আছেন। আর আমার দিকে না-তাকিয়েই তিনি ওই স্বগতোক্তির সঙ্গে সঙ্গে খাতার পাতায় কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং আঁকছিলেন। আমি আস্তে আস্তে হেঁটে তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। তারপর তিনি আমার দিকে আঁড় চোখে তাকাতেই আমি বললাম, আমি এখানে নীতিকথা শুনতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি আমার বাবার সত্যিকার অসুখটা কি? তার আসলে কী হয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ঘৃণ্য লোকটা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে, শেষে চীৎকার করে বললো—তোমার বাপের সেরে ওঠার কোনো আশা নেই। বড়ো জোর আর ছমাস সে বাঁচতে পারে। বুঝলে?

ধন্যবাদ—আমি বললাম, ঠিক এটাই আমি জানতে চেয়েছিলাম। কথা শেষ করে আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম। আমি চৌকাঠ পেরোবার আগেই বোধহয় বুড়োর মনে হলো, তাঁর ভুল হয়ে গেছে। তিনি দ্রুত আমার কাছে এলেন এবং বললেন—দ্যাখো বাছা, আমি একেবারে মরে যাওয়ার কথা বলিনি। বলতে চেয়েছি, কঠিন ব্যামো, বুঝলে? আমি ভ্রূক্ষেপ না করে দরজা পেরিয়ে বাইরে পা দিলাম এবং পাশের ঘরে অপেক্ষমান রোগীদের, শুনিয়ে চেঁচিয়ে বললাম—যা বয়েস হয়েছে তোমার বুড়ো ব্যাঙ—তুমিই পটল তুলবে শিগগীর!

আমি বাড়ি ফিরে ডাক্তারের অভিমতকে যথেষ্ট নমনীয় করে তা মাকে জানালাম। বললাম, অবস্থা খুবই নাজুক। তবে বাবা যদি নিজে হুসিয়ার থাকে এবং নিয়ম মেনে চলে—সেরে উঠবে। বাবার কানে একথা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। দুধ খেতে শুরু করলো সেদিন থেকেই। আর আশ্চর্য, যে লোকটা প্রায় বছর খানেক যাবৎ আধা-অচল অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলো, সে অল্পদিনের মধ্যেই পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো রাস্তায়। ক্রমশ তার শরীরে শক্তি ফিরে আসতে লাগলো। এমনকি সে নিকটস্থ গোরস্থানে পর্যন্ত নিয়মিত যেতে শুরু করলো।

কবর খানায় ঢুকে অবশ্য বিষন্নতায় আক্রান্ত হতো না সে—বরং তাকে বেশ উৎফুল্লই মনে হতো। বাড়ি ফেরার সময় সে কবরখানার বাগান থেকেই চয়ন করে নিয়ে আসতো নানা রকম ফুল। আমি তাকে বাইবেল পড়ে শোনাতাম। আর বাবা বলতো—এতে তোমার মঙ্গল হবে!

আট

বাবা যেন কেমন শিশুর মতো হয়ে উঠলো। ঘন ঘন গির্জায় যেতে শুরু করলো বুড়ো। ধর্মীয় অনুষ্ঠান একটাও বাদ দিতো না। কখনো বা ফাদারের ওখানে। তা, মিনিস্টার হয়তো বললেন, 'গির্জার প্রেসিডেন্ট খুবই সৎ-আত্মার অধিকারী। তাঁরই এবার পুনঃ-নির্বাচিত হওয়া উচিত। ব্যাস—বাবা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঠিক এই কথাটিই উচ্চারণ করতে থাকবে অবিরাম। সবাইকে অনুরোধ জানাতে শুরু করবে, বর্তমান প্রেসিডেন্টকেই যেন আবার তারা ভোট দেয়।

কী? না, ফাদার বলেছেন! ফাদার কি আর মিথ্যে বলতে পারেন? বস্তুতঃ বাবার এক নতুন শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছে গীর্জার সংস্পর্শে এসে। নয়তো ফাদার একদিন পিরামিড সম্পর্কে মন্তব্য করলেন। আর যায় কোথায়? পিরামিডের আদ্যোপান্ত

জানবার জন্যে লোকটা ক্ষেপে উঠতো। নিজে জান বার পর তা আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্যকে না জানিয়ে তার স্বস্তি ছিলো না। ফলে অন্যরাও এইসব বিষয়ে প্রায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতো। অর্থাৎ বাবা দিনের পর দিন, পাঁড় ভক্ত হয়ে উঠছিলো ওই মিনিষ্টারের। কিন্তু একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা বাবার জীবনের পথটাকে আবার দিলো ঘুরিয়ে। সে শুনলো—ফাদার এখান থেকে অর্থাৎ এই গির্জা থেকে চলে যাচ্ছেন নিউ রচেলের গির্জায়। কেন? না, যেখানে তিনি বেতন পাবেন বেশি। কথাটা বাবার বিশ্বাস হলো না। স্রেফ বেশি বেতনের জন্যে এরকম মহৎ-প্রাণ একজন মানুষ কর্মস্থল তথা ধর্মস্থল বদলে ফেলবেন, তা কি করে সম্ভব? কিন্তু নিজেই সে একদিন গির্জায় গিয়ে, খোদ ফাদারের মুখে শুনে এলো এই সিদ্ধান্তের কথা। ফাদারের যুক্তি 'ওদেরও তো একজন ফাদার দরকার?' কিন্তু যুক্তিটা আদপেই যুৎসই লাগলো না বাবার কাছে। সে থমথমে মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরলো। তার মুখটা কাগজের মতো সাদা। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো পেলে আঁকড়ে ধরে—বাবাও নাকি তেম্নি কাঁদতে কাঁদতে আছড়ে পড়েছিলো ফাদারের পায়ে, যাতে তিনি দ্রবীভূত হন। মত বদলান। কিন্তু না, তিনি সিদ্ধান্তে অটল।

বলতে গেলে, ঠিক তখন থেকেই আমুল পাল্টে গেলো বাবা। তার চেহারা খারাপ হয়ে গেলো। কেমন যেন খিটখিটে হয়ে গেলো মেজাজ। সে যে কেবল খেতে বসে প্রার্থনা করতেই

ভুলে গেলো তাই নয়। তার চার্চে যাওয়াও বন্ধ হলো। তার গোরস্থানে ঘুরঘুর করার পুরোনো অভ্যেসটা আবার ফিরে এলো। সেখানে গিয়ে একটা বেঞ্চের ওপর বুড়ো চুপচাপ বসে থাকতো। সে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলো আবার। বিষাদের একটা স্থায়ী ছাপই যেন পড়ে গেলো তার মুখে। কিছুদিন আগেও যে লোকটা করমর্দনে-করমর্দনে ক্লান্ত হয়ে পড়তো পথে বেরুলে, সে রূপান্তরিত হলো ঘোরতর অসামাজিক মানুষে। লোকটা যেন এক ডোডো পাখি, যে বালির মধ্যে মুখ লুকিয়ে থাকে। আমি আর কখনো বাবাকে হাসতে দেখিনি। তিনি যেন এক জীবন্মৃত। আগে ঘুমের মধ্যে তার নাক ডাকতো না। এখন ডাকে। মনেহয়, এ তার নাক ডাকা নয় মৃত্যু-চীৎকার!

নয়

হাইম তার পুরোনো ঢঙেই জীবন যাপন করছে। ডিম্বকোষের অসুখ যথারীতি বাড়ছিলো তার স্ত্রীর। বস্তুতঃ হাইম তার স্ত্রীর অণ্ডকোষেই আটকা পড়ে গিয়েছিলো। এটা পরিণত হয়েছিলো তার প্রাত্যহিক প্রসঙ্গে। কথায় কথায় স্বরচিত যৌন প্রবাদ উচ্চারণ করতো সে। আর যে বক্তব্যই সে শুরু করুক তা শেষ হতো গিয়ে ডিম্বকোষে! আজকাল সে সাপের মতোই জড়াজড়ি করে রাত কাটায় তার বলয়ের সঙ্গে। এবং আলিঙ্গন-

মুক্ত হবার আগে একটি বা দু'টো সিগারেট তাকে খেতেই হয়। সে নির্বিকারে আমাকে জানায় তার বউয়ের পচন-ধরা ডিম্ব-কোষ থেকে কীভাবে উষ্ণ লাভা স্রোত বেরিয়ে আসে। এবং ব্যাধিগ্রস্ত রমনী-রমণে যে আলাদা রোমাঞ্চ সে তার সবিস্তার ব্যাখ্যা করে। তার মতে, রোমাঞ্চ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে! মোটকথা হাইম আছে ওই নিয়েই। নৈশাহারের শেষেই, নিজেদের পায়রার খোপের মতো ছোট্ট ঘরে তারা সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হাইম বিভিন্ন সময়ে তাদের বহু-বিচিত্র রমন-রীতির চমকপ্রদ বিবরণ আমাকে দিয়েছে। যেমন, তার বউয়ের যোনিটা নাকি ঠিক ঝিনুকের মতো আচরণ করে। লাগাবার সময়, নুনুটা যখন এক বিশেষ জায়গায় পৌছে, তখন যোনির দু'টি পাল্লা তার ওপর ঝিনুকের দু'টো কপাটের মতোই মৃদু মৃদু চাপ দিতে থাকে। ওহ—তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় ঠিক পাগল হয়ে যাবার মতো!

মাঝে মাঝে তারা সঙ্গম-রত হয় কাচির কায়দায়। এবং সিলিংয়ের সঙ্গে আটকানো আয়নার তা আনুপূর্বিক অবলোকন করে। হাইম একথাও অকপটে জানায়, যে প্রতিবার লাগাবার সময় সে এক একটা নতুন মেয়েকে ধর্ষণ করছে বলে কল্পনা করে। ফলে সঙ্গম হয় জোরালো এবং টাটকা। আর এভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বীর্যপাত আটকে রেখে কাজ করে যায়। ওর বউতো অবাক! হাইম বলে —এই দামী জিনিষ অমন বাজে খরচ করে লাভটা কি?

অবশ্য সময়ের দিক থেকে এখনো শীর্ষে আছে স্টিভ রেমেরো। ওর শরীরটা ঠিক ষাড়ের মতো। সে যত্রতত্র তার বীর্য ছিটিয়ে

বেড়াচ্ছিলো। আমরা অফিসের লাগোয়া রেস্তোরাতে বসেই এসব আলোচনা করতাম। জায়গাটার পরিবেশ ছিলো অদ্ভুত। হয়তো ওখানে মদ ছিলোনা বলে ওরকম মনে হতো। অথবা হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র ব্যাঙের ছাতা ওখানে পরিবেশিত হতো বলে। যাই হোক কুকথার শুরু করতে এখানে কোনো অসুবিধে হতো না। স্টিভ হয়তো ইতিমধ্যে তার কাজকর্ম সেরেই এসেছে। তবে হ্যাঁ, স্টিভ লোকটার ভেতরে বাইরে সমান পরিষ্কার। বস্তুত; খাঁটি মানুষের সে ছিলো এক মূর্তিমান দৃষ্টান্ত। খুব উজ্জ্বল নয়—অবশ্যই। তবে একটা ভালো ডিম এবং চমৎকার সঙ্গী। অন্যদিকে হাইম ঠিক তার বিপরীত। যৌনতার লালসা যেন তার চোখে মুখে লেগে থাকতো আঠার মতো। খাবারের প্লেটের দিকে তাকালে সে তার মধ্যেও যেন দেখতে পেতো বীর্য! যখন গরম পড়তো, সে বলতো, আবহাওয়াটা অণ্ডকোষের জন্যে ভালো। ট্রলি চেপে কোথাও যাবার সময় সে ওই ট্রলির চলার ছন্দে পেতো সঙ্গমের সাদৃশ্য। সে মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে নিতো এজন্যে যে, আমরা নিশ্চয়ই একটা সাঁসালো মাগি পাকড়াও করবো। একা-একা সে তেমন ভালো মাল ম্যানেজ করতে পারতো না।

আমাদের সঙ্গে থাকলে তার একটা বড়ো সুবিধে ছিলো এই যে, সে ভদ্র-যোনির স্বাদ পাবার সুযোগ পেতো ইহুদি হয়ে। সে বলতো—ভদ্র যোনির গন্ধই আলাদা! আহ্, সে বড়ো চমৎকার। এমনকি সঙ্গমের মাঝামাঝি এসেও সে খুশিতে হাসতে শুরু করে দিতো ছেলে-মানুষের মতো। যাকে বলা যায়, একেবারে আহলাদে আটখানা।

তবে একটা জিনিষ সে মোটেই সহ্য করতে পারতো না। সেটি হচ্ছে কালো-যোনি। ভ্যালেসকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই বলে আমার প্রতি তার ক্ষোভের অন্ত ছিলোনা। একদিন অবশ্য আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলো, মালটা আদতে কী রকম। কোনো রকম বিশেষত্ব আছে কিনা, গন্ধটা তীব্র কিনা! আমি জবাবে জানিয়ে ছিলাম, তা তো আছেই। যেমন যোনিটা অমসৃন। এবড়ো খেবড়ো! আর এজন্যেই মেয়েটাকে এতো পছন্দ করি আমি। হাইম সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে মুখ বিকৃত করলো।

কিছু কিছু ব্যাপারে হাইম ছিলো রীতিমতো শুচিবাই গ্রস্থ। খেতে বসে জামার হাতায় দাগ লাগলে পাগল হয়ে যেতো সে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সে অনবরত চুল আঁচড়াতে থাকতো। পকেট থেকে ক্ষুদে আয়না বের করে বারবার মুখের সামনে মেলে ধরতো। দেখতো, দাঁতের ফাঁকে কুটোকাটা আটকে আছে কিনা। ওরকম কিছু আবিস্কৃত হলে, সঙ্গে সঙ্গে ন্যাপকিনে মুখ আড়াল করে দাঁত কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে তা বের করে তবে রক্ষা! অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, তার বউয়ের ডিম্বকোষের কাটাকুটো আয়না মেলে দেখবার কোন উপায় ছিলো না। কিংবা সে নিতে পারতো না তার ঘ্রাণও। বউ ছিলো তার অবিরল ধারার কুকুরী—ঠিকই। কিন্তু সারাদিন ধরে সে তার ডিম্বকোষ ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো করে রাখতো রাত্রের ব্যবহারের জন্যে। সে তার ডিম্বকোষের জন্যে এতোটা মনোযোগ দিতো, তা ছিলো সত্যি বিস্ময়কর!

যেদিন পর্যন্ত না তাকে হাসপাতালে নেয়া হলো, ততোদিন অব্দি

সে ছিলো সাদা-সঙ্গমী নারী। চিকিৎসার শেষে আর কোনদিন এসব করা যাবে না, এই সন্দেহ তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলো। আর হাইমও ছিলো একই চিন্তার মানুষ। বউকে জড়িয়ে ধরে, ধর্ষণ করতে করতে সে যখন সিগারেট খেতো আর নিচের রাস্তায় চলমান যুবতীদের দেখতো, তখন কল্পনাও করতে পারতো না যে একটি মেয়ে মানুষকে ধর্ষণ করা আবার কখনো স্থগিত হতে পারে। সে নিশ্চিত ছিলো, অস্ত্রোপচার সফল হবে এবং বউটা আগের চেয়েও সোয়াদের হয়ে উঠবে। সে তার পাছার ওপর হাম্‌লে পড়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে বলতো, 'সোনা মানিক একটু কাৎ হয়ে শোবে? এই একটুখানি, লক্ষীটি···এইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে। এই রকম করে। আমি যেন কি বলছিলাম? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি ওসব ব্যাপার নিয়ে এতো চিন্তা করছো কেন বলো তো! সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি, তুমিই তো আমার সব। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? শোনো, —একটুখানি সরে এসো। এই, এই তো, চমৎকার।'

হাইম রেস্তোরাঁয় বসে আমাদের কাছে এইভাবে বর্ণনা দিয়ে যেতো অবিরাম। স্টিভ তো হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তো এসব কথা শুনে। স্টিভের পক্ষে হাইমের পদ্ধতির কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিলো না। সে ছিলো অতি মাত্রায় সৎ—বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। সে জন্যেই তো কপাল খুললো না গর্দভটার।

ওদিকে কার্লি তো কার্লিই। ভাগ্যের বরপুত্র। মেঘ না চাইতেই

বৃষ্টি নামতো তার জন্যে। স্টিভ ওকে ভীষণ ঘেন্না করতো। ঘেন্না করতো ওর মিথ্যাচারের জন্যে। স্টিভ অবশ্য টাকা পয়সার ব্যাপারেই ইঙ্গিত করতো। কিন্তু হাইম কালিকে দেখতে পারতো না, সে তার খালার বিষয় ওরকম বেহায়ার মতো অকপট ছিলো বলে।

ঃ যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ!—এই ছিলো কালির সম্পর্কে হাইমের মন্তব্য। সে আরো বলতো—'বানচোতটা ওর আপন বোনকেও লাগাতে পারে।'

হাইমের বক্তব্য ছিলো, একমাত্র বেশ্যা ছাড়া যে কোনো মেয়ের প্রতি সামান্য হলেও সম্মান বোধ থাকা দরকার মানুষের। বেশ্যারা মহিলা নয়, তারা বেশ্যাই। আর মহিলারা মহিলাই। হাইমের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো এই রকম। অবশ্য কালির ওপর তার রাগ ছিলো অন্য কারণে। কালি মউজ লুটতো হাইমের পয়সায়। আর যে কায়দায় সে টাকাটা বের করে নিতো, তা ছিলো হাইমের কাছে অসহ্য। সে বলতো—ছোড়াটার চরিত্র বলতে কিছু নেই। এবং আমার দিকে ফিরে বলতো—আর তুমি? তোমারই কি তা আছে? সোনার চান্—পিত্‌লা ঘুগু? আমি বলতাম—আমার চরিত্রবান হবার সময় পার হয়ে গেছে রে খান্‌কির পুত। কিন্তু কালি—! ও তো পুঁচকে বাছুর!

ঃ ওকে হিংসে করো বলে মনে হচ্ছে!—বলতো স্টিভ।

ঃ হিংসা করছি? আমি?—এই কথা বলে একটুখানি হাসতো হাইম। তারপর আমার দিকে ঘুরে বলতো—'শোনো! কবে তোমাকে

আমি হিংসা করেছি বলতে পারবে? তুমি বলামাত্র আমি মাগি ম্যানেজ করে আনিনি তোমার জন্যে! এস, ইউ,—অফিসের লাল চুলো মেয়েটার কথা কি ভুলে গেছো? নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি। অমন প্রকাণ্ড দুধ দু'টোর কথা তো চিরজীবন মনে থাকবার কথা। আর পাছাটা? আমি ওই রকম একটা মেয়েমানুষ যোগাড় করেছিলাম, কেননা তুমি চেয়েছিলে। কিন্তু কালির জন্যে আমি কখনো একাজ করবো না, বুঝলে? গোল্লায় যাক ছোকরা। নিজের কবর নিজে খুঁড়ে নিক!

সত্যি কথা বলতে কি, কালি নিজের কার্যসূচী বাস্তবায়িত করে চলেছিলো নিষ্ঠাভরেই। সে একযোগে কারবার চালিয়ে যাচ্ছিলো পাঁচ থেকে ছ'টা মেয়ের সঙ্গে। বিস্ময়ের ব্যাপার, এর একজন হচ্ছে খোদ ভ্যালেসকা। আর একজন হচ্ছে ভ্যালেসকার সেই চাচাতো বোনটা। ভ্যালেসকা মজা পেতো বাথ টাবে বিদ্ধ হতে। পানির নিচে পুং-লিঙ্গ গ্রহণে তার আনন্দের অন্ত ছিলো না। কালি ওর চাচাতো বোনটাকে লাগাতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কেননা সে নাকি ওভাবেই মজা পেতো। কখনো কখনো মেয়েটি ওর শিশ্ন মুখে নিয়ে আইসক্রিমের মতো লেহন করতো মানে চুষতো। হঠাৎ করে আলতোভাবে দাঁত বসাতো নুনুতে। কখনো বা মেয়েটাকে সে তার দু'পা শূন্যে তুলে, দু'হাত মেঝেয় রেখে —ওভাবেই লাগাতে আরম্ভ করতো। তারপর ওভাবেই তারা হাতে হেঁটে ঘরময় ঘুরে বেড়াতো। কখনো তারা শুরু করতো কুকুরের কায়দায়। মেয়েটি যখন কেঁউ কেঁউ করতো, তখন কালি

সিগারেট ধরিয়ে তাতে কষে একটা টান দিয়ে ভুস্ করে এক গাল ধোঁয়া ছাড়তো তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে। একবার বীর্যপাত হয়ে গেলে সে মেয়েটির যোনির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো মস্ত একটা গাজর! কী অমানুষিক কাণ্ড!

সময়টা ছিলো এমন, মনে হতো আমি নিজেও বাসা বেঁধেছি এক যৌন-ভবনে। ওপর তলার মেয়েটির কথাই বলি। মেয়েটা মাঝে মধ্যেই নিচে, আমাদের ফ্ল্যাটে আসতো। আমার স্ত্রী প্রায়ই ওকে ডাকতো আমাদের বাচ্চাটাকে দেখা শোনা করার জন্যে। হাবা গোবা মেয়ে। আমি তাকে কোনো রকম ইঙ্গিত দিইনি প্রথমে। কিন্তু অন্যদের মতো, তারও তো একটা যোনি আছে। তবু, এ ব্যাপারে ও বোধকরি খুব একটা সচেতন ছিলোনা। সে যতো আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে লাগলো, ততোই তার অবচেতন মন দিয়ে আঁচ করতে লাগলো যে ওই বস্তুটি তার সত্যিই আছে!

একদিন। অনেক্ষণ হয়ে গেলো, মেয়েটি বাথরুমে ঢুকেছে—আর বের হবার নাম নেই। আমার সন্দেহ হলো। আমি দরজার চাবির ফুটোয় চোখ লাগালাম এবং যা দেখার, দেখলাম। সে উবু হয়ে তার ছোট্ট পুষির ওপর টোকা মারছে আঙুল দিয়ে। কেবল টোকাই যে দিচ্ছে তা নয়—সে তার সঙ্গে যেন কথা বলছে। আমি এতোটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে, কি করবো, প্রথমটায় তা ভাববারও শক্তি ছিলেনা আমার। পরক্ষণেই যেন চেতনা ফিরে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের বড়ো ঘরে ফিরে এলাম আমি। নিভিয়ে দিলাম সব ক'টা আলো। তারপর একটা সোফার ওপর বসে

রইলাম, বাথরুম থেকে ওর বেরিয়ে আসার অপেক্ষায়। আমার চোখে এখনও যেন ভাসছে ছোট্ট রোমশ যোনিটা, যার ওপর সে অঙ্গুলি চালনা করছে।

আমি আমার ফ্লাইয়ের বোতাম খুলে দিলাম। যেন কৌচে বসেই তাকে সম্মোহিত করতে উদ্যত হয়েছি। বলা যায়, আমার লিঙ্গের মাধ্যমেই আমি সম্মোহিত করতে চাইলাম তাকে। মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলতে শুরু করলাম, আয়, আয় আয়! এখানে এসে তোর যোনি ফাঁক করে আমার সামনে দাঁড়া। আশ্চর্য, মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গেই যেন অনুভব করতে পেরেছে এই বার্তাটি। সে বাথরুমের দরজা খুলে, এই অন্ধকার ঘরে ঢুকে, যেন অনুমান করে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো কৌচের দিকে। আমি টু-শব্দটিও করিনি—। নড়িনি এক চুলও। আমি কেবল আঁধারের মধ্যে কাঁকড়ার মতো ঘুরতে থাকা যোনির কথাই ভাবছি তখন। শেষে মেয়েটি হাতড়াতে হাতড়াতে ঠিক কৌচের পাশে এসে থেমে গেলো। তার মুখেও কোনো কথা নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আর যেই আমি হাত বাড়িয়ে তার পা দুটিকে ধরেছি, সে ফুটখানেক এগিয়ে এলো তার রস গড়াতে থাকা যোনিটিকে উন্মুক্ত করে। জীবনে এরকম ভিজে যোনিতে আমি হাত দিইনি। আঠার মতো পিচ্ছিল রস গড়িয়ে পড়ছিলো তার পা বেয়ে বেয়ে। এবং দেয়ালে যদি কেউ পোষ্টার লাগাত চাইতো, এ আঠায় নির্ঘাৎ ডজনখানেকের ও বেশি সাটা যেতো। মুহূর্তের মধ্যে গাইগরু যেমন ঘাসের মধ্যে মুখ নামায়, ঠিক সেই ভঙ্গীতে সে আমার নুনুটা মুখে তুলে নিল। আর

আমি আমার এক হাতের সবগুলো আঙুল একত্রিত করে ওর পুষির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণে ঘাটাঘাটি করতে লাগলাম। মেয়েটার মুখ ভরে গেলো রসে। পা বেয়ে তো অবিরল গড়াচ্ছে। কারো মুখে তখনো কোনো কথা নেই। দু'জনকে মনে হচ্ছে অন্ধকারে কর্তব্য-রত দুই উন্মাদ গোর খোদাকের মতো। সঙ্গমের স্বর্গসুখ বুঝি একেই বলে! আমি ভাবলাম, লাগাতে লাগাতে যদি আজ মগজও বেরিয়ে আসে, তবু ক্ষান্ত দেয়া চলবে না। আমি জীবনে যতো মাগি করেছি, এমন গভীর আনন্দ আর পাইনি।

কিন্তু হায়, মেয়েটি আর একবারও তার কাপড় খোলেনি। সে রাত্রে নয়। তার পরের রাত্রে নয়। কোনো রাত্রেই নয়! যেন পুরো ঘটনাটাই ছিলো আমার কাছে স্বপ্ন। যেন সে রাতে আমি বিচরণ করেছিলাম স্বপ্নের দেশে। যেন আমি বালুকা বেলায় শায়িত হয়েছিলাম এক ছোট্ট ডলফিনের মতো। যখন সে আমাকে তার উচ্ছাসে আপ্লুত করে দিলো, যখন তার রসের ঝর্ণা উৎক্ষিপ্ত হলো, আমার মনে হলো : নর খাদকরা চিবিয়ে খাচ্ছে, ফুল, হৈ হৈ করে সদলবলে ছুটে আসছে বন্য বাণ্টুরা, রডোডেনড্রনগুচ্ছ পিষে ফেলছে অলীক ঘোড়া ইউনিকর্ন!

বেচারা জন ডো। জাহাজী মানুষ। কোন্ সমুদ্রে এখন সে ভসছে কে জানে। আর এদিকে ওর বউ এমি ডো যাপন করছে নিঃসঙ্গ জীবন। আর তাতেই তো তার যোনিটা এতো অক্ষত, এমন তর তাজা রয়ে গেছে। দশ লাখের মধ্যেও এরকম উপাদেয় যোনি পাওয়া যায় না। এ যেন অনেকটা সেই দুষ্প্রাপ্য মুক্তো—যোসেফ কনরাড

পড়বার সময় ডিক অসবোর্ন যা পেয়ে গিয়েছিলেন। মেয়েটি যেন ছিলো যৌনতার এক মহাসাগর, যার চারদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মানবিক তারা মাছ। একজন অসবোর্নই কেবল পারেন তাকে আবিষ্কার করতে, তার যোনির অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে।

সে ছিলো যেন কাফিরদের খপ্পরে পড়া এক দণ্ডাধীনা। দু'পায়ের ফাঁকে একগুচ্ছ লোম ছাড়া সে ছিলো একটা মাছের চেয়েও নগ্ন। সে ছিলো অবশ্য মাছের চেয়েও লতানো কেননা মাছেরও কাঁটা থাকে তার সে বালাই ছিলোনা। একদিকে তার আর্কটিক সাগর অন্যদিকে মেক্সিকো উপসাগর। আর আমাদের সংলাপ হীন প্রণয়লীলায় যার কথা দু'জনের কেউই প্রকাশ করেনি সে হচ্ছে কিং কঙ। সেই কিং কঙ। যে ঘুমিয়ে আছে সাগরের নিচে; টাইটানিকের ধংসাবশেষের ওপর, যেখানে কোটিপতিদের কঙ্কাল জ্বলছে ফসফরাসের মতো। ···সে ছিলো এক মাইল লম্বা লোমশ হাত এবং পা-ওয়ালা বিয়ের কেক। সে ছিলো ঘূর্ণয়মান পর্দা। যেখানে জ্বলতে থাকে সর্বশেষ সংবাদ। সে ছিলো অক্ষয় রিভলভারের নল···যৌনব্যাধিতে বিনষ্ট হাত।

বস্তুত ব্যাপারটা ছিলো এমন, যা শোভা পেতো প্রস্তর যুগের মানুষের ক্ষেত্রেই। একটা গোলক ধাঁধাঁ। একটা বিশাল গহ্বর যার মধ্যে যে কোনো জিনিষ এমন কি খোদ হিমালয়কে পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেয়া যায়। এ কোনো গন্তব্য নিয়ে যায় না কাউকেই। এটা একটা গণ্য হবার মতো ধর্ষণ কোনো নির্মান

কর্ম নয়। ···মহা প্লাবনের প্রাক্কালে মহা-তরণীতে জীবন যাপন। বৃষ্ট বৃষ্টি, বৃষ্টি। কিন্তু বিশাল নৌকার গর্ভে সবকিছুই শুকনো মচমচে। সব জিনিষেরই এক জোড়া করে নমুনা। এবং চমৎকার ওয়েষ্টফলিয়ান হ্যাম, টাটকা ডিম, জলপাই, পেঁয়াজ, ওয়ার চেষ্টারশায়ার সস্; এবং অন্যান্য উপাদেয় আহার্য সমভার! ঈশ্বর আমাকে মনোনীত করেছেন নুহ রূপে; একটা নতুন স্বর্গ, নতুন পৃথিবী সৃজন করার মানসে। তিনি এই বিশাল তরণী ভরে দিয়েছেন নানা আবশ্যকীয় তৈজসে। দিয়েছেন ঝঞ্ঝা- ক্ষিপ্ত সাগর অতিক্রম করার নাবিক-বিদ্যা। সম্ভবতঃ মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীতে প্রয়োজন হবে নতুন ধরনের জ্ঞান। কিন্তু এখন সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। বাকিটা—ধরা যাক, সেকেণ্ড এভিন্যুর কাফে রয়্যালে দাবা প্রতিযোগিতা। আমি চতুর, ইহুদী-মনোভাবাপন্ন এমন একজন দাবা-সঙ্গী কামনা করছি -যে প্লাবনের শেষ দিন অব্দি খেলা চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, অতিরিক্ত হবার মতো সময় আমার নেই। আমি দাবাই বা কেন খেলবো! আমার পুরানা ইয়াররা রয়ে গেছে না—! জানি-দোস্ত্ লোগোস, বুসিফেলাস, এবং আরো কয়েকজন! কেন দাবা খেলবো?

এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি ঘটবে কখন? চিন্তা তো মানুষকে আসলে কোথাও নিয়ে যায় না। সব যাত্রা শেষ হলেই একটা ডিপো অথবা একটা গোলাবাড়ি। একটা লাল লণ্ঠন যা নাকি ধম্‌কে

উঠে বলবে—'থামো'। কিন্তু যখন কিনা একটা পুরুষাঙ্গ চিন্তা করতে শুরু করে, তখন কোনো থামাথামি নেই। এই কথাটা ভাবতে গিয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আরো একটা যোনির কথা। ভেরোনিকার কথা—যে সব সময় আমার চিন্তাকে নিয়ে যেতো ভুল পথে। যেমন নাচের আসরে দেখা গেলো, সে তোমাকে পাকাপাকি ভাবে গেঁথে নিতে চাইছে তার ডিম্ব কোষের মধ্যে। কিন্তু পরক্ষণে দেখা যাবে তাকে জড়িয়ে ধরেছে একরাশ ফালতু চিন্তা। টুপির চিন্তা, মানিব্যাগের চিন্তা যে খেলাটি তার জন্যে অপেক্ষা করছে তার চিন্তা। যে চিঠি ডাক বাক্সে ফেলার কথা মনে মনে নেই, তার চিন্তা, যে চাকরিটা সে হারাতে বসেছে, তার চিন্তা। এই রকমই সর্ব বিচ্ছিরি চিন্তাভাবনা। এসবচিন্তা তার মস্তিষ্ক থেকে মুহূর্তের মধ্যে যোনিতে ছড়িয়ে পড়তো বিদ্যুতের মতো। এরকম স্পর্শ-কাতর যোনির কথা কল্পনাও করা যায় না। একে দর্শনিক-যোনিও বলা যেতে পারে। অন্ধকারে লিঙ্গাবদ্ধ হতে পছন্দ করতো ভেরোনিকা। ঠিক বাদুড়ির মতো। এমন অন্ধকার, যাতে বোতামটি পর্যন্ত দেখা যায়না। মাছ খাচ্ছি না মুরগি খাচ্ছি! আমি অন্ধকারে যে জিনিষটা ধরে আছি, তা কি কেবল চমৎকার, নাকি অতি চমৎকার? জবাব ছিলো অজানা। তাকে ফাঁদে ফেললে সে তোতা পাখির মতো চিল্লাচিল্লি করতো। আবার তার পোষাকের নিচে জিনিষটা ঠেকালেই সে পিছ্‌লে যেতে শুরু করতো বায়েন মাছের মতো। জোরজবরদস্তী করলে সে কাম্‌ড়ে পর্যন্ত দিতো!

যাধানাই পানাই করতো মাগিটা। ম্যালা সময় লাগতো ওকে ভাও করতে। কেন? সে এরকম করতো কেন? মূলতঃ সে ছিলো এক উড্ডীন পায়রা—যার পা লোহার দাঁড়ে বাঁধা আছে শিকলী দিয়ে। কিন্তু তুমি তার পায়ের শিকলী খুলে দিলে সে কি করে? উড়ে না-গিয়ে তোমার কোলেই ঠাঁই নেয়!

দশ

ওর পাছাটা যা দুর্দান্ত ছিলো উফ—ভাষা যায়না। ওকে দেখলে ইশকুলের জ্যামিতি বইয়ে পড়া সেই সংজ্ঞাটির কথা আমার মনে হতো। সেই সংজ্ঞাটি, যাতে একজন অন্ধ কর্তৃক তাড়িয়ে নেয়া দুটি সাদা গাধা ছাড়া বাঁধা পেরুনো যায়না। যানিনা, কেন আমার এরকম মনে হতো! তবে বুড়ো ইউক্লিডের এটাই ছিলো সমাধান। সত্যি, খুব জ্ঞানী ছিলো ওই বুড়ো শকুনটা। সে একটা ব্রীজ বানিয়েছিলো, যা জীবদ্দশায় কেউ পেরুতে পারেনা। সে এর নামও দিয়েছিলো পনস অ্যাসিনোরাম। কেন? কেন না, তার এক জোড়া সাদা গাধা ছিলো। আর গাধা দুটিকে সে এতো ভালোবাসতো যে তাদের অন্য কারুর হস্তগত হওয়ার কথা সে ভাবতেও পারতো না!

যাহোক ভেরোনিকাও ছিলো একই নায়ের নাইওরী। সে তার সুন্দর পাছা জোড়ার ব্যাপারে এতো মনোযোগী ছিলো, যার বিনিময়ে অন্য কিছুর কথা চিন্তাও করতে পারতো না মনে হতো, মরবার সময় সে তার পাছা নিয়েই স্বর্গে যাবে। তার যোনির ব্যাপারে ও একই বৃত্তান্ত। তাকে বিদ্ধ করো; কিন্তু চোখ নিয়ে তা দেখতে পারবে না। ওসব করবে তো ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও। বস্তুতঃ এ ছিলো এক বিদঘুটে অ্যালজেব্রা—রাত ফুরোলে একটা 'এ' অথবা 'বি' ছাড়া যার কাছে আর কিছুই পাওয়া যেতো না।

তুমি তোমার পরীক্ষায় পাশ করলে। তুমি ডিপ্লোমা পেলে। এবং তার পরেই ঢিলে হতে শুরু করলে। তার মানে তুমি তোমার পাছা নিয়ে বসতে শুরু করলে—তোমার যোনি রসায়িত হতে শুরু করলো। পায়খানা এবং পাঠ্য-বইয়ের মধ্যবর্তী যে জায়গাটা রয়েছে, সেখানে তোমার প্রবেশ নিষেধ। কেননা সেখানে সাবধান বানী ঝুলছে। লেবেল মারা আছে—'ধর্ষণ'! তুমি আর যা-ই করোনা কেন, কদাচ ওই সমস্ত করতে পারবে না। আলো কখনো পুরো নেভানো হয়নি, রোদ্দুর কখনো পুরো ঢুকতে দেয়া হয়নি। একটি বাড়ুড়কে বিশিষ্ট করে তোলার জন্যে সব সময়ই নেয়া হয়েছে পূর্ণ আঁধার বা পরিপূর্ণ উজ্জলতার আশ্রয়। অথচ ক্ষীণ আলোটুকুর প্রয়োজন ছিলো মনটাকে সজাগ রাখার জন্যে। ব্যাগ, পেন্সিল, বোতাম, চাবি—এসব জিনিষের ওপর নজর রাখার স্বার্থে। তুমি এগুলোর কিছুই ভাবোনি—কেননা তোমার মগজটা ছিলো ইতিমধ্যেই টই-টম্বুর। মনটা ছিলো যেন এক নাট্যশালার শূণ্য আসন, যেখানে স্বত্বাধিকারী

ফেলে গেছে তার টুপি।

আমার ধারণা, ভেরোনিকার যোনি কথা বলতো। অর্থাৎ বাঙময় যোনি! পক্ষান্তরে ইভলিনের যোনি ছিলো হাস্যমুখর। ইভলিনও থাকতো ওপর তলাতেই—তবে ভিন্ন একটি বাড়িতে। খেতে বসে লোককে হাসাবার ঝোঁক ছিলো তার। সুরসিকা মেয়ে। আমার সারা জীবনে দেখা সত্যিকার রসিকা রমনী! তার সবকিছুতেই এমনকি লাগানোর সময়ও ছিলো কৌতুক। কঠিন এবং অপ্রিয় প্রসঙ্গকেও কৌতুকে তরল করে দেবার দুর্লভ ক্ষমতা তার ছিলো। এটা অবশ্যই একটা সদ্‌গুণ। তবে হ্যাঁ, ইভলিন উত্তেজিত হলে তার যোনি পরিণত হতো একটা হরবোলায়! ওর যোনিটা ছিলো শিক্ষিত সীল মাছের মতো। সে গানও গাইতো। এবং যোনি সশব্দ হলেই তুমি শিশ্ন ঢুকিয়ে দাও সঙ্গে সঙ্গে!

যাই হোক, আমি মগ্ন ছিলাম এই সমস্ত নিয়েই। নিজেকে মনে হতো কলা-কাহিনীর সেই লোকটার মতো, যে পৃথিবীর বুকে একটা ছিদ্র তৈরী করছে। তার উদ্দেশ্য, পৃথিবীর অন্য পিঠে গিয়ে পৌঁছুবে। কিন্তু আমি কি সত্যি সত্যি তা চাইতাম? কেননা পৃথিবীর অপর প্রান্তে পৌঁছুতে ইচ্ছে করলে আমি খোঁড়া-খুড়ির বদলে চীনের উদ্দেশ্যে একখানা ভাড়াটে-প্লেন নিয়েই বেরিয়ে পড়তে পারতাম। কিন্তু শরীর অনুসরণ করে মনকে। শরীরের পক্ষে যা সহজ, মনের জন্যে সব সময় তা সহজ না-ও তো হতে পারে! এবং সেটিই সবচেয়ে মারাত্মক—যখন দেহ আর মন একই সঙ্গে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করে।

বর্ণনাতীত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করার একটি আঙ্কিক পদ্ধতি আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ রমন এবং বিশুদ্ধ যোনি—এই দুটি বিষয়বস্তু আসলে বর্ণনা-সীমানার বাইরে। এগুলোর উল্লেখ আপনি করতে পারেন—কিন্তু অবশ্যই তা রাজ-সংস্করণে। নইলে পৃথিবী দু'ফাঁক হয়ে যাবে না! বিশ্বটাকে একত্রিত করে রেখেছে কে? আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এর যে জবাব আমি পেয়েছি, তা হলো যৌন-সঙ্গম। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গম আর বাস্তবের যোনি এমন কিছু ব্যাপার সন্দেহে ধারণ করে আছে যা নাইট্রো-গ্লিসারিণের চেয়ে সাংঘাতিক। তা, এই বাস্তবতার শনাক্তিকরণের জন্যে তুমি অ্যাংলিকান চার্চের দেয়া সিয়ার্স রোবাক-এর তালিকাটি হাতড়ে দেখতে পারো।

তালিকার তেইশ পৃষ্ঠাতেই পাবে এই ছবিটি। প্রোথেনিনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে উলঙ্গ প্যারিপাস। তার হাতে এক খণ্ড উদ্যত কর্ক। সে বলছে, 'সঙ্গম করো নিজের সঙ্গে!' পটভূমিতে দেখবে রেমব্রান্টের আঁকা প্রভু যীশুর শরীর—ক্রুশবিদ্ধ করার পর ইহুদীরা যে দেহ আবিসিনিয়াতে নিয়ে যায়। আবহাওয়া উষ্ণ ও সুন্দর। চোখে পড়ছে কেবল আবছা কুয়াশা। রোদ্দুরে শুকোতে দেয়া হয়েছে ঘোড়ার মাংসের বড়ো বড়ো টুকরো। চারদিকে ভন্ ভন্ করছে মাছি। আদ্যিকালে হোমার যেরকম বর্ণনা করেছিলেন, হুবহু সেইরকম! ছাখো—একদিকে ফসল মাড়াইয়ের যন্ত্র। গম কাটা হয়ে গেছে। দূরের মাঠে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিচ্ছে ক্ষেত-মজুররা। হ্যাঁ—এই হচ্ছে প্রাচীন হেলেনীয় পৃথিবীতে সঙ্গম নামক আচ-

রণের প্রথম দিন। এই ঘটনাকে বর্ণাঢ্য এবং বিশ্বাস যোগ্য ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্যে জেইস্ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধন্যবাদ। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত চরিত্রগুলো কি চেহারায় এই রকম? দেবতা প্যারিপাস আসলে দেখতে কীরকম তা কে বলতে পারে? এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিন্তা করছি অন্যরকম। আমার মতে ভুলবশে পার্থেননের ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্যারিপাস ভাবছিলেন এক দূরান্তিক যোনির কথা। তিনি এতো গভীর ভাবে স্বপ্নাচ্ছন্ন ছিলেন যে, ফসল মাড়াই বা ক্ষেত মজুরদের কথা চিন্তা করবার মতো অবকাশ তাঁর আদপেই ছিলোনা। এটা আমার নিজের ধারণা। ভুল হলেও, আমি নিঃসন্দেহে নিজের পক্ষপাতিত্ব করবো।

আমি বলবো, দেবতা অস্পষ্ট কুয়াশার ভেতর থেকে জেগে ওঠা দৈবী-ধ্বনি শুনে সহসা দেখলেন এক বিশাল জলাভূমি। সেখানে বিচরণ করছে সদানন্দ নাভাজোরা। আকাশে উড়ছে সাদা শকুনের পাল। তিনি আরো দেখতে পেলেন, অতিকায় একটি শ্লেট, যাতে আঁকা রয়েছে যীশু, আবসালম আর শয়তানের শরীর। তিনি দেখলেন ব্যাঙের রক্তে লাল পুঞ্জীভূত সাদা ফেনা। হঠাৎ তিনি শুনলেন, তাঁর দু'পায়ের মাঝখান থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠে আসছে। নিজের দীর্ঘ শিশ্নের সাহায্যে তিনি এমন মোহনীয় সঙ্গীত সৃষ্টি করলেন, যে ঐশী পবিত্রতাকে পরিপূর্ণ করে তুলতে আকাশ থেকে নেমে এলো কন্ডর শকুনের পাল। তাদের অসংখ্য বিশালাকৃতি ডিমে ভরে গেলো সমস্ত

জলাভূমি। আর এই আনন্দময় দৃশ্য অবলোকন করে, পাথরের বিছানায় শুয়ে থাকা আমাদের প্রভু যীশু খৃষ্ট লাফিয়ে উঠে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন পাহাড়ী ছাগলের মতো। শৃংখলিত ফেলাহীনরা মিশর থেকে এলো যুযুধান ইগোরেট আর জাঞ্জিবারের মানুষখেকোদের আগে আগে!

আমার বিবেচনায়, এই হচ্ছে প্রাচীন হেলেনীয় পৃথিবীতে যৌন সঙ্গমের প্রথম প্রহর! অবশ্য তখন থেকে আজ পর্যন্ত—পৃথিবীর সবকিছুই ব্যাপক ভাবে বদলে গেছে। এখন আর নিজের শিশ্নের ভিতর দিয়ে গান গাওয়া যায়না! কিংবা জলাভূমি জুড়ে ডিম পাড়ানো যায়না কনডর শকুনদের। সঙ্গম-সাম্রাজ্যের কথা এখন পুথির পাতায় বন্দী পৌরানিক কাহিনী। আমার অধুনিক কল্পনার সঙ্গে তাই পুরানের মশলা কিছু মেশাতেই হয়েছে। ফেলাহীনরা বালির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। তাদের শরীরের শেষ অংশটুকু উদরস্থ করছে ক্ষুধার্ত শকুনেরা। চারদিকে ধীর স্থির শান্ত ভাব। দশ লক্ষ সোনালি ইঁদুর খুব্‌লে খাচ্ছে অদৃশ্য পনির। চাঁদের আলো পড়েছে নীল নদের পানিতে। ···এটা এরকম···দেখা যাচ্ছে হাস্য মুখর এবং বাঙময় যোনি। ভূমিকম্প-লেখা যোনি, ক্ষ্যাপা যোনি, নরখাদক যোনি, যা নাকি হাঁ করে তেড়ে আসছে তিমির মতো। তোমাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে। আসছে ঝিনুক-যোনি, যার মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে একটি বা দু'টি মুক্তো। আছে নৃত্যপরা যোনি, যা শিশ্নের সঙ্গে আন্দোলিত হবার এক পর্যায়ে প্লাবিত হয় ভয়াবহ ভাবে। আসছে সজারু-যোনি, খৃষ্টমাসের সময় যা ছোট ছোট পতাকা

নাচায়। আসছে টেলিগ্রাফিক-যোনি যা ব্যবহার করে মোর্স-কোড এবং মনের মধ্যে ফেলে রেখে যায় একরাশ বিন্দু আর ড্যাশ্। রয়েছে রাজনৈতিক যোনি ও নিরামিষ যোনি। এমনকি মিসসেলেনিয়াস বা বিবিধ-যোনিও রয়েছে। যোনির অভাব নেই। চারদিকে অগনিত যোনি। কিন্তু প্রকৃত আনন্দময় সেই যোনিগুলো কোথায় অদৃশ্য হয়েছে, কে জানে! জীবনটা যেন হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে থাকে শো-উইণ্ডোর ভেতরে। আলোকিত শুয়োরের মাংসের মতো। যেন তাতে এক্ষুণি কোপ পড়বে কুড়োলের। সত্যি বলতে কি, এতে ভয় পাবার কিছু নেই কেননা সংসারের সব কিছুই সুন্দর ভাবে, মিহি করে কাটা এবং সেলোফেনে জড়ানো। হঠাৎ সাইরেনের আওয়াজ এবং সারা শহরে ব্ল্যাক আউট। বিষাক্ত গ্যাসে ভরে আছে সারা শহর। বোমা ফাটছে। মানুষের ছিন্ন ভিন্ন শরীর ছিট্কে উঠছে শূন্যে। বিদ্যুত আছে সর্বত্রই। আছে রক্ত, বোমার টুকরো এবং লাউডস্পিকার। শূন্যচারি ঘাতকরা কী খুশি—আহ্ ভাবা যায়না। গ্যাস এবং আগুনে মাংস মজ্জা পুড়ে যখন শেষ, ঠিক তক্ষুণি শুরু হয় কঙ্কাল-নৃত্য।

সবিস্ময়ে ভাবি, এই কি পৃথিবীর পতন? শুভ্র তুষারের ওপর লক্ষ লক্ষ নৃত্যরত কঙ্কাল দেখে নগর-নির্মাতারা ভাবছে, আর কি কোনো কিছু জন্মাবে? খাবার এবং মদ কি আর পাওয়া যাবে? অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, পৃথিবীতে একজন হলেও আমি জীবিত থাকবো। ধ্বংসলীলার শেষে শো-উইণ্ডোর ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করবো। আমার দু'পাশে ছড়িয়ে থাকবে ধ্বংসাবশেষ।

সারাটা পৃথিবীই হবে আমার।

হঠাৎ—এসে পৌঁছাল একটা দূর পাল্লার তারবার্তা! আর এই তারবার্তাই যেন আমাকে মনে করিয়ে দিলো, আমি একা নই। তাহলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়নি। যাক বাবা, বাঁচা গেলো। মানুষ আসলে নিজেকে ধ্বংস করতে পারে না। সে কেবল অপরকেই ধ্বংস করতে সক্ষম। ধেৎ তেরিকা! শেষ হয়েও যেন শেষ হবার নয় মানুষ। আবার তার যাত্রা শুরু হবে। ঈশ্বর আবার অবতীর্ণ হবেন রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে। যাবতীয় অপরাধের বোঝা তিনিই কাঁধে তুলে নেবেন। মানুষ আবার সৃষ্টি করবে সঙ্গীত। পাথরের প্রাসাদ আবার গড়ে উঠবে। এবং সেইসব কথা ছোট ছোট বইয়ে তারা লিখেও রাখবে। ইস্—কী জঘন্য উচ্চাভিলাষ! আমি আবার বিছানায়। প্রাচীন গ্রীক-ভূবন—যৌন সঙ্গমের প্রথম প্রহর এবং হাইম! হাইম আছে আগের মতোই তার পুরনো ধরনে। নদীতীরের রাস্তায় তার চোখ জোড়া একই জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছে আগের মতোই। বলেছে—'লক্ষ্মীটি একটু ঘুরে শোও —হ্যাঁ হ্যাঁ এই ভাবে!' আমার জানালার নিচে আমি ব্যাঙের ডাক শুনতে পাচ্ছি। কবরখানার বিশাল ব্যাঙ। সঙ্গমরত ভেক সকল!···

···আমি হংকংয়েও ছিলাম কিছুদিন। বইয়ের এজেন্ট হিসেবে। আমার পকেটে ছিলো মেক্সিকান ডলারে ভর্তি মানি ব্যাগ। আমি ধর্মভাব নিয়ে সেইসব চীনাদের দেখতে যাই, যাদের আরো কিছুটা শিক্ষিত হওয়া দরকার। আপনি যেমন হুইস্কি আর সোডার জন্যে

ফোন করেন, তেমিন আমি হোটেলে বসে ফোন করতাম মেয়ে মানুষের জন্যে। ভোরবেলা আমি তিব্বতী ভাষা শিখতাম। কেননা শিগগীরই আমার লাসা যাওয়ার কথা। আমি ইহুদীভাষা অনর্গল বলতে পারি। হিব্রুও। আমি মুহূর্তে দু'সারি অঙ্কের যোগফল বলে দিতে পারি। কিন্তু তাতে চীনাদের কী লাভ! দুত্তোর বলে আমি সোজা ফিরে গেলাম ম্যানিলায়। সেখানে আমি মিঃ রিকোকে যোগাড় করলাম এবং তাকে শেখালাম রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় ছাড়া বই বিক্রির নিয়মকানুন। যাবতীয় লভ্যাংশ আসতো জাহাজ ভাড়ার হার থেকে। কিন্তু যদ্দিন ওকাজে লেগেছিলাম—তাতেই আমি সক্ষম ছিলাম বিলাসী জীবন যাপনে। কিন্তু এখন? যৌন-সঙ্গমের বিশাল ধরিত্রীতে আমি একা, আমি নিঃসঙ্গ। নদীর বুকে নৌকা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যার যেমন খুশি আমাকে খাটাতে পারে। এই যৌন-সঙ্গমের পৃথিবীতে কোনো প্রাণী নেই, নক্ষত্র নেই, সমস্যা নেই। এখানে কোন কিছুই অনুমান করা যায় না। ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অতীত ও প্রস্থানের অযোগ্য। জন্ম নেয়া প্রতি দশ লাখের ৯৯৯,৯৯৯ জন এখানে অক্কা পায় এবং আর জন্মায় না। কিন্তু একজন বাড়ি বানায়। সুনিশ্চিত জীবন যাপন করে। জীবন থাকে একটা বীজের মধ্যে—যার ভেতরে আছে আত্মা। খনিজ পদার্থ, গাছের চারা, হ্রদ, পর্বত সব কিছুরই আত্মা আছে।

নদীতে নৌ-যাত্রা। ···বক্র ক্রিমির মতো ধীর গামী, কিন্তু বাঁক সামলাতে পারঙ্গম। বায়েন মাছের মতো পিচ্ছিল। 'তোমার

নাম কি ? কেউ চীৎকার করে বলে—'আমার নাম ? কেবল আমাকে ঈশ্বর বলে ডাকো কেন—বরং বলো গর্ভস্থ-ঈশ্বর !' আমি নৌকা বেয়ে চলেছি। কেউ আমাকে একটা টুপি কিনে দিতে চেয়েছিলো। 'কী মাপের টুপি পরো তুমি ? হে জড়বুদ্ধি ?' সে চীৎকার করে বলে। 'কী মাপ বললে ? দশ নম্বর ? (কেন তারা এতো চেঁচিয়ে কথা বলে আমার সঙ্গে ? আমি কি বধির ?) টুপিটা অবশ্য পরে হারিয়ে গেছে। ঈশ্বরের কি টুপির দরকার ? চারদিকে কোটি কোটি মানুষ—যেন সরষে-বীজ। এমনকি স্থবির ঈশ্বরের পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি নেই। হিমালয়ের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ী ছাগল। সে প্রশ্ন করেনা, কী ভাবে চুড়োয় উঠতে হয় ! সে ওখানেই চরে বেড়ায়। সময় হলে নিচে নেমে আসে।

ম্যাক্সি স্ক্যানাডিগের কথা আমি কেন ভাবি, তা কে জানে ! একি দস্তয়েভস্কী পড়ার দরুন ? যে রাত্রে আমি দস্তয়েভস্কী পড়ি, তা আমার জীবনের এক অন্যতম চিহ্ন। এমন আমার প্রথম প্রেমের চেয়েও তা স্মরণীয়। এই বইটা পড়বার পর চেনা পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে সম্পূর্ণ পাল্টে গেলো। জাগতিক মালিন্যে ভরা দুনিয়াটা আমার সামনে থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেলো চিরতরে। কোনো আশা আকাঙ্খার কথা লিখতে বিস্মৃত হলাম আমি অনেক দিনের জন্যে। আমি যেন তখন যুদ্ধ পরিখায়, গুলিবৃষ্টির মধ্যে দীর্ঘ সময় যাপনকারী সৈনিক। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ কামনা বাসনা আমার কাছে ছিলো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। আমি আমার তখনকার অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝাতে পারবো,

যদি ম্যাক্সি আর ম্যাক্সির বোন রীটার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা খুলে বলি। তখন আমি আর ম্যাক্সি দু'জনেই খেলাধুলোয় খুব উৎসাহী। আমরা সাঁতরাতে খুব ভালোবাসতাম। এমন সময়ও গেছে, যখন আমাদের সম্পূর্ণ দিন ও রাত একটানা কেটে গেছে সমুদ্র-তীরে। ম্যাক্সির বোন রীটাকে এর আগে আমি একবার কি দু'বার দেখেছিলাম। প্রথম দেখার পর ওর নাম কি জিজ্ঞেস করলে ম্যাক্সি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলো সঙ্গে সঙ্গে। আমি খুবই মনঃক্ষুন্ন হই ওর এই দুর্ব্যবহারে। ওর সঙ্গে মিশতে তখন আমার এমনিতেই ভালো লাগে না। ওর কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। ওকে তখনো সহ্য করছিলাম এজন্যে যে ও প্রয়োজনে ধারকর্জ দিতো, এটা ওটা প্রেজেন্ট করতো। যাই হোক, যখনি আমরা সমুদ্রতীরের দিকে রওয়ানা হতাম, আমার মনে একটা ক্ষীণ আশা থাকতো যে, আকস্মিকভাবে ওর বোনটা আমার সামনে পড়ে যাবে। কিন্তু না। সে সব সময় তার বোনকে রাখতো আমার নাগালের বাইরে।

একদিন আমরা বাথ-হাউসে যখন কাপড় ছাড়ছি, ম্যাক্সি আমাকে তার নুনু দেখিয়ে বললো,—'দেখেছো, আমারটা কতো সুন্দর, কতো মজবুত।' আমি বললাম, 'তা দেখলাম। খাসা নুনুটি তোমার। কিন্তু বলো তো দেখি, রীটার কি হয়েছে? ওকেও তো মাঝে মধ্যে সঙ্গে আনতে পারো।' —ম্যাক্সি তো আমার কথা শুনে—হ্যা! আমি বললাম—ওকে সঙ্গে আনলেই আমি ভালো করে ওর কুইম্

—হ্যাঁ কুইম্‌টা দেখতে পারি। আশা করি, জিনিষটা কি, তা তুমি বুঝতে পেরেছো।

ওডেসা থেকে আসা ইহুদী হিসেবে শব্দটা তার চেনা নয়। যাই হোক, শব্দের মর্মোদ্ধারে তার দেরী হয়নি। সে খুবই দুঃখিত হয়ে বললো—দ্যাখো হেনরী, তোমার কাছ থেকে ঠিক এই ধরনের ব্যবহার আশা করিনি।

ঃ কেন নয় ?'—আমি বললাম,—'তোমার বোনের তো একটি যোনি আছেই। নাকি নেই ?' আমি আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সে প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠলো। মনে হলো, অনেকটা নিরুপায় হয়েই ব্যাপারটা তখনকার মতো সাম্‌লে নিলো। কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না, খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়েছে সে। সারাদিন ও আমার সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতেই পারলো না। আর এই নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে যাতে আমি সাঁতরাতে গিয়ে পানিতে ডুবে যাই মনে মনে নিশ্চয়ই সে তা কামনা করলো। আমি দিব্য চোখে দেখতে পেলাম ব্যাপারটা।

শেষে ভাবলাম, না হয় আমি ডুবেই মরলাম ; তা-ও যদি অন্যান্য মেয়েদের মতো ওর বোনেরও একটা যোনি থাকে !

সেদিনকার মতো সাঁতরানো শেষ হলে কাপড় চোপড় পরে আমরা নাশতা খেলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হলো, খানিকটা একাকীত্ব দরকার। তাই করমর্দন করে বিদায় নিলাম আমি ম্যাক্সির কাছ থেকে। হঠাৎ আমার প্রচণ্ড রকম একা মনে হলো নিজেকে। মনে হলো, যখন একাকীত্বের ঢেউ আমাকে ঘূর্ণিঝড়ের মতো

আঘাত করলো, আমি অন্যমনস্কভাবে তখন উপড়ে ফেলছি আমার দাঁতগুলো। রাস্তার কিনারে দাঁড়ানো এই আমাকে দেখলে এখন কারো বুঝাতে অসুবিধে হবে না যে, আমি সদ্য সদ্য আঘাত পেয়েছি।

এগারো

হঠাৎ চারদিক অন্ধকার করে ঝড় এলো। জনশূন্য হয়ে পড়লো রাস্তা-ঘাট। শেষে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হলো। আমার মনে তখন চিন্তা একটাই—গাড়ি ভাড়া। যীশু—বেজম্মা ম্যাক্সি একটা টাকাও দিয়ে যায়নি। আমার নিজের পকেটেও নেই একটি পেনীও। হের দস্তয়েভস্কী জুনিয়র বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরতে লাগলো! কিন্তু গাড়ি ভাড়া জোগার করে নেবার মতো চেনামুখ সে একটাও খুঁজে পেলোনা। আমার মনে পড়লো সেই দিনটির কথা, যেদিন ম্যানিকিন পরা ম্যাক্সিকে আমি জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। তাকে দেখবার পর আমি আবার পড়লাম দস্তয়েভস্কীর কয়েকটি পাতা। তারপর হঠাৎ একটা মারাত্মক চমক—একটা গোলাপ-ঝোপের মতোই রীটার আবির্ভাব! মখমলের মতো মসৃন যার ত্বক। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে দেখতে পেলাম আমি নিউইয়র্ক গামীট্রেনের কামরায়। এবং আরো কিছু সময় পর স্টেশনে ট্রেন থামলে, আমি কেবল নেমেছি—সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি, রীটা।

ব্যাপারটাকে টেলিফোনে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে রীটাকে। জানানো হয়েছে তার সম্পর্কে আমার মনোভাবকে। তাই মেয়েটি ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আমার ওপর। আমরা রেস্তারায় বসলাম পাশাপাশি। বেড়ার মধ্যে ঝগড়ায় মত্ত দুই খরগোসের মতোই মনে হচ্ছিলো আমাদের দুজনকে। আমরা নাচের আসরে ছিলাম আড়ষ্ট। আমি অবশ্য তাকে আমার বাসায় নিয়ে যেতে পারতাম—কেননা বাসায় তখন আমি একাই আছি। কিন্তু না, আমি তারই বাসায় গেলাম, তাকে এগিয়ে দিতে। ইচ্ছে ছিলো, ম্যাক্সির নাকের ডগায়, ওদের নিচের বারান্দাতেই ওর বোনের কুইম দেখবো। এবং আমি আমার ইচ্ছা পূরণ করতে বাকিও রাখলাম না।

আমার মনে পড়ে গেলো জানালায় ম্যানিকিন পরে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক্সির কথা। সমুদ্রতীরে তার রাগ ও অট্টহাসির কথা। কিন্তু তখন আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ। আমি আমার আঙুলের ডগা রীটার পুষির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করছি। যখন ওর অবস্থা—সখি, ধরো ধরো—তখন ওকে মেঝে থেকে উঠিয়ে আমি খুব ভদ্রভাবে, বেশ জায়গা মতো আমার জিনিষ ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সে যে তাণ্ডবলীলা শুরু করলো, তাতে আমার মনে হলো ওর যোনি ছিঁড়ে উড়ে যাবে। আমি কিন্তু বীর্যপাত ঘটালাম এবং ওই রমন্ ক্লান্ত রমনীকে আবার শুইয়ে দিলাম মেঝের ওপর। টুপিটা ওর চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে এক কোনায়। ব্যাগ খানা মুখ-খোলা অবস্থায় ধরাশায়ী। সেখান থেকে কিছু খুচরো পয়সাও ছড়িয়ে পড়েছে বাইরে। যাই হোক, ঘটনাটা ঘটলো বাথ-হাউসে

ম্যাক্সিকে তার কুইম্ দেখাবার ইচ্ছা প্রকাশ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এরকম রোমহর্ষক ও চিত্ত-উদ্দীপক সঙ্গম সংসারে কটা হয়। রীটার যোনির তুলনা হয়না সত্যি। যখন লাগাচ্ছিলাম শেষ দিকে তো আমার মনে হয়েছিলো, আমার শিশ্নটা এক অথবা দু'ইঞ্চি বেশি লম্বা হয়ে গিয়েছে। আমি তাকে উপুড় করে শোয়াতে চেয়েছিলাম এক পর্যায়ে। কিন্তু সে আপত্তি জানিয়েছিলো। কিন্তু তখন তার বাঁধ ভাঙ্গলো—সে অস্ফুট গলায় বলতে লাগলো—করো করো—লাগাও, লাগাও লাগাও! ···আমিও তখন প্রায় উন্মত্ত। আমি ক্ষ্যাপার মতো ঘা মারতে শুরু করলাম সেই গভীর দামামায়।

এতো কিছুর মধ্যেও আমার মগজ কুরে কুরে খাচ্ছিলো বাসায় ফেরার গাড়ি ভাড়ার চিন্তা। রীটা আমাকে কয়েক ডলার ধার দিলো। কিন্তু হায়—তখনো কিন্তু শেষ হয়নি খেলা। রীটা আমার নুনু মুখে নিলো। এবং তাতে আলতোভাবে জিব বুলোতে লাগলো। আমি তখন চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখছি। তার দুটি পা প্রসারিত ছিলো আমার কাঁধের দু'পাশ দিয়ে। এবং যোনি আমার জিহবার ডগায়। আমি আবার তার ওপর চড়াও হয়ে তাকে বিদ্ধ করতে চাইলাম। কিন্তু সে বায়েন মাছের মতোই পিছলে যেতে শুরু করলো। আর তারপর সেই গুহামুখ যেন বিস্ফারিত হলো আমার চোখের সামনে। সেখান থেকে তীব্র বেগে বেরিয়ে এলো যেন তপ্ত লাভাস্রোত। অবিস্মরণীয় সেই গহবর। জীবনেও সে অভিজ্ঞতার কথা ভোলা সম্ভব নয়। আহ্—কী দুর্দান্ত যোনি-মুখ! ওডেসা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে ম্যাক্সি এমন কিছু স্মৃতি আমার

সামনে তুলে ধরেছিলো, যা আমিও হারিয়েছি শৈশবে। যদিও ওডেসা সম্পর্কে আমার ধারণা তখন ছিলো অস্পষ্ট। কিন্তু আমার কাছে এর আভাস ছিলো অনেকটা যেন ব্রুকলিনের সেই ছোট্ট পাড়াটির মতো। জায়গাটা একদিন এতো প্রিয় ছিলো আমার! কিন্তু একদা সেখান থেকেও বিচ্ছিন্ন হতে হলো আমাকে। পরিপ্রেক্ষিত-হীন কোনো ইতালীয় চিত্র দেখলেই আমার মনে জেগে ওঠে ওই মহল্লাটির প্রতিচ্ছবি। ছেলেবেলায় আমার দিন কেটেছে ওই পাড়ার উত্তর আর দক্ষিণ অংশের সীমারেখায়। সেই জায়গায় রাস্তাটির নাম ছিলো নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীট। সেখান থেকে হেঁটে চলে যেতাম ব্রডওয়ে-ফেরী পর্যন্ত।

রাস্তাটা আস্তে আস্তে ভরে উঠেছিলো ইহুদীতে। আমার কাছে এলাকাটা ছিলো খুবই রহস্যময়। যেন দুই পৃথিবীর সীমান্ত। আর আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি ওই দুই সীমান্তের মধ্যবর্তী এলাকায়। একটি বাস্তব, অন্যটি কাল্পনিক। এবং এই ভাবকল্প নিয়েই আমি পরের দিনগুলো কাটিয়ে এসেছি সেখানে। গ্রাণ্ড স্ট্রীট আর নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীটের মাঝামাঝি একটা পুঁচকে রাস্তার নাম ছিলো ফিলামোর প্লেস। আমার দাদার বাড়ির উল্টোদিকে ছিলো এই ছোট রাস্তাটা। তখন আমরা সবাই থাকতাম ওই বাড়িটাতে। বাড়ির সামনের রাস্তাটা ছিলো যেন এক হটমালার দেশ! এরকম ভীড়-ভাটার রাস্তা আমি জীবনে কখনো দেখিনি। সেই আশ্চর্য রাস্তায় চলাফেরা করতো বালক, প্রেমিক, পাগল, মাতাল, জ্যোতিষী, গায়ক, কবি, দর্জি, মুচি আর রাজনীতিবিদ।

বিচিত্র রাস্তার বিচিত্র মানুষগুলো সুখদুঃখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলো। তবে হ্যাঁ, তারা সবাই ছিলো মিলেমিশে। একটা নীরেট একাত্মতা। এই লোকগুলোর সংহতি বিনষ্ট হবার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না, যদি রাস্তাটি তার নিজের সংহতি অটুট রাখতে পারে!

কিন্তু এই ছবি কতোদিন টিকে থাকলো? উইলিয়ামবার্গ ব্রীজ তৈরী হবার আগে পর্যন্ত। সেতু তৈরী হলো। আর নিউ ইয়র্কের ডেলান্সি স্ট্রীট থেকে পালে পালে আসতে লাগলো ইহুদীরা। ব্যাস্—আমাদের ছোট রাস্তা ছোট পৃথিবীর সংহতি আর বজায় থাকলো না। ফিলামোর প্লেস নামে সেই ছোট রাস্তা—যে তার নামের মতোই বয়ে বেড়াতো মূল্যবোধ, মর্যাদা, আলো আর বিস্ময়—তার মহাত্ম খুইয়ে ফেললো। ইহুদীরা এলো এবং মথেরা যেমন জীবনের তন্তু খেয়ে ফেলে, তেমনিভাবে তারা সব সৌন্দর্য গলধঃকরণ করতে শুরু করলো। সব শেষ হয়ে গেলে সেখানে কেবল জেগে রইলো তাদের মথ সুলভ উপস্থিতিই।

অল্পদিনের মধ্যে রাস্তাটা ভরে গেলো দুর্গন্ধে। ভদ্রলোকেরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। বাড়িঘর গুলোর দিকে যেন আর তাকানো যায়না। যেন প্রধান দাঁত গুলো পড়ে যাওয়া এক একটা কদাকার মুখ। ময়লায় থিক্ থিক্ করছে চারধার। দেখতে দেখতে রাস্তার কিনারগুলো হাঁটু অব্দি ভরে উঠতে লাগলো পচা শাক সবজীতে। ফায়ার এস্কেপগুলো পরিপূর্ণ হয়ে গেলো রক্তমাখা ন্যাকড়াও আরশোলায়। বদ্লে যেতে

থাকলো দোকানের সাইন বোর্ড। অসংখ্য বেবী-ক্যারিজে আচ্ছন্ন ছোট রাস্তাটা এমনকি প্রতিটি দোকানের সামনেও বাচ্চাদের গাড়ি। ক্রমে এলাকা থেকে ইংরেজি ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেলো। তার বদলে শোনা যেতে থাকলো বিশুদ্ধ ইদ্দিশ। ভাষাটা এমন প্রানচমকানো যে, তাতে ঈশ্বর এবং পচা তরকারির উচ্চারণ এক রকম শোনায়। আমরাই প্রথম ওই পাড়া ছেড়ে চলে এলাম। অবশ্য বছরে দুতিন-বার আমি বেড়াতে যেতাম ওই পুরনো পাড়ায়। যেতে হতো কোনো জন্মদিন, ক্রিষ্টমাস কিংবা পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানে। প্রতিবারই মনে হতো, আরো যেন কী একটা হারিয়েছি আমি। এটা ছিলো খারাপ স্বপ্নের মতো। নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হচ্ছিলো এলাকাটা। যে বাড়িটাতে আমার আত্মীয়রা তখনো বাস করছে, সেটি ছিলো ধ্বংসোন্মখ পুরনো দুর্গের মতো। বাড়ির একটি অংশে তারা যাপন করতো নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন দ্বৈপায়ণের জীবন। মনে হতো, হানাবাড়ির এই বাসিন্দারা খুবই নিম্ন মানের। তাদের এতোদুর অধঃপতন ঘটেছিলো যে তারা ইতিমধ্যেই নিজেদের ইহুদী পড়শিদের নানা গুণপনা জাহির করতে শুরু করেছিলো আমাদের কাছে। আশ্চর্য! তারা নাকি ইতিমধ্যে ইহুদীদের কারো কারো মধ্যে মানবিকতা, সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা, দয়া, সহানু-ভূতি, দানশীলতা ইত্যাদি আবিস্কার করে ফেলেছে। ব্যাপারটা আমার কাছে ছিলো হৃদয় বিদারক। ইস্—আমার হাতে যদি একটা মেশিন গান থাকতো—এ পাড়ার সব কটা ভদ্দরলোক আর ইহুদীকে মেরে বিছিয়ে ফেলতাম!

সেবার কর্তৃপক্ষ নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীটের নাম বদলে করলেন মেট্রো-পলিটন এভিনিউ। এই সড়ক দিয়েই ভদ্রলোকেরা করবখানায় যেতো। এখন তো জায়গাটা পরিণত হয়েছে—কি বলে—ট্রাফিকের স্নায়ু কেন্দ্রে। নিউ ইয়র্কের দিকটাতে, নদীতীরে সারি সারি মাথা তুলেছে গগন চুম্বী সব বাড়ি। আবার অন্যদিকে, অর্থাৎ ব্রুকলিনের দিকটাতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে ওয়্যের-হাউস, গ্লাজা, বিশ্রামাগার, সাঁতারুদের ঘর, মনোহারী দোকান, আইসক্রিম পার্লার, রেস্তোরাঁ আর বস্ত্র-ভাণ্ডার। বস্তুতঃ সবকিছুতেই পরশ লেগেছিলো শহুরেপনার।

আমরা যদ্দিন ওখানে ছিলাম, কখনো ওটিকে মেট্রোপলিটন—এভিনিউ বলিনি। কাগজে কলমে নাম বদল হলেও রাস্তাটিকে সবাই বলতো নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীট। আট অথবা দশ বছর পরে। একদিন আমি নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি—মেট্রোপলিটন লাইফ ইনস্যুরেন্স বিল্ডিংয়ের বিশাল টাওয়ার আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তখনি আমার মনে হলো, নর্থ সেকেণ্ড স্ট্রীটটা আর নেই। আমার কল্পনার সীমান্ত রেখা বদ্‌লে গেছে। আমার দৃষ্টি যেন গোরস্থান, নদী, নিউ ইয়র্ক নগরী, নিউ ইয়র্ক রাজ্য এমনকি যুক্তরাষ্ট্র থেকেও অনেক দূরে চলে গেছে। আমার মনে পড়ে গেলো, আমাদের সেই পুরনো পাড়াটির কথা।

একদিন রাত্রে রাস্তায় হাঁটছিলাম আমার পুরনো বন্ধু স্ট্যানলি আর আমি। সে মিলিটারির চাকরি থেকে সবে ফিরে এসেছে। আমরা দুজনেই ছিলাম খুব বিমর্ষ। একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে

অনুভব করা কঠিন হবে—আমরা কী ভাবছিলাম তখন। ইউরোপে একটি শহরের যখন আধুনিকায়ন ঘটে—তারা প্রাচীন মাত্রকেই বিনষ্ট করেনা। বরং নতুনের পাশে সযত্নে তার সংরক্ষণ করে। কিন্তু আমেরিকায় অতীত-নিদর্শনের ধারণাটিকেও পর্যন্ত মুছে ফেলা হচ্ছে মানুষের মগজ থেকে। এখানে নতুন এসে পুরনোকে উৎখাত করছে গায়ের জোরে। নতুন অর্থাৎ সেই মথ—যা ভক্ষণ করে জীবন-তন্তু। পেছনে হাঁ-করা একটা কালো গর্ত ছাড়া আর কিছুই সে রেখে যায়না। স্ট্যানলি আর আমি যেন সেইসব ভয়ঙ্কর গর্তের মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলাম। একটা যুদ্ধ বোধ করি এতো বিভ্রান্তি আর বিনষ্টি আনতে পারেনা। আমেরিকায় পুনর্জন্ম নেই। আছে কেবল অসুস্থ বাড় বাড়ন্ত। নতুনের ওপর নতুনের স্তর। বিষাক্ত পেশী—যা একটি অন্যটির চেয়ে কুৎসিত।

সঙ্গীতের কথা মনে হলেই আমার মনে সঙ্গমের ছবি ভেসে ওঠে। আমি যদি গান গাই কিংবা শুনি—মনে হয় চারদিকে জোনাকির মতো উড়ে বেড়াচ্ছে যোনিরা। আমার এ রকম ধারণার পেছনে কারণ আছে একটি। কারণটি হচ্ছে লোলা। লোলানিসেন। আমার এ ধরণের অসুস্থতার জন্যে এই মেয়েটিই দায়ী। যেমন বিচিত্র নাম, তেমনি অদ্ভুত চরিত্র। সত্যি বলতে কি লোলাকে ঠিক সুন্দরী বলা যায়না। বরং খানিটা বাঁদরীর মতোই ছিলো তার মুখের আদল। তবে ওর মাথার একরাশ কালো চুলই আমাকে আকর্ষণ করছিলো।

লোলা আমাকে গান শেখাতো। পিয়ানোর সামনে, ওর পাশে একটা টুলের ওপর যখন আমি বসতাম—পারফিউমের গন্ধ নাকে আসতো আমার। আমি উত্তেজিত হয়ে পড়তাম ওই ঘ্রাণ নাকে আসবার সঙ্গে সঙ্গে। গরমের দিনেও ও পরতো ঢিলে-হাতার পাতলা জামা। যার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যেতো ওর বগলের লোম! এই লোমগুলো যেন হন্যে করে তুলতো আমাকে। মনে হতো, লোলার সারা শরীরেই আছে ওইরকম লোম—এমনকি নাভির ভেতরেও। আর আমি তখন কি চাইতাম? আমি চাইতাম সেখানে গড়াগড়ি খেতে, সেখানে দাঁত বসাতে। আমি যেন স্বপ্নের মতোই অবলোকন করতাম একটা রজঃস্বলা মাদী গরিলাকে। এবং এরকম ভাবতে ভাবতেই শিকেয় উঠেছিলো আমার সঙ্গীত সাধনা। আমি ওর রোমশ যোনি প্রত্যক্ষ করবার আশায় এতো ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম যে একদিন এঁটেই ফেললাম একটা মতলব। ওর ছোট ভাইটাকে কিছু ঘুষ দিলাম, যাতে সে বাথরুমে স্নানরতা তার বোনকে এক পলক দেখবার একটা ব্যবস্থা আমাকে করে দেয়।

আমি যেরকম ভেবেছিলাম, জিনিষটা তার চেয়ে অনেক সুন্দর! একবার ভাবুন তো! নাভির নিচ থেকে তলপেটের শেষ মাথা পর্যন্ত ঘন মসৃন রোমরাজি। হাতে বোনা কম্বলের মতো তা পুরু। যখন সে ওই জায়গাটিতে পাউডার ছড়াতে শুরু করলো, মনে হলো, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। কয়েক দিন পর। লোলা আমাকে গান শিখাচ্ছিলো যথারীতি। আমি ফ্লাইয়ের একটা বোতাম

খুলে টুলের ওপর বসেছিলাম। ব্যাপারটা তার নজর এড়িয়ে গেলো খুব সম্ভব। এর পর আমি খুলে ফেললাম সবগুলো বোতাম। এবার সে দেখতে পেলো। এবং বললো, মনে হচ্ছে তুমি কিছু ভুলে গেছো হেনরী!—আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। তারপর প্রায় জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী?

সে আমার ফ্লাইয়ের দিকে না-তাকিয়ে স্রেফ তর্জনি তুলে দিক্-নির্দেশ করলো। তবে তার আঙুলটা তখন আমার ফ্লাই প্রায় ছোঁয় ছোঁয়। আমি আর নিজেকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না। খপ্ করে তার হাতটা ধরে সোজা ঢুকিয়ে দিলাম ফ্লাইয়ের ফাঁকে। কিন্তু সে তড়াক করে লাফিঁয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। তার সারা মুখ ফ্যাকাশে। ভয়ে থর থর করে কাঁপছে সে। ইতিমধ্যে যেন লাফ দিয়েই বাইরে বেরিয়ে এসেছে আমার নুনুটা এবং আহলাদে ব্যাটা যেন ডগমগ করছে। আমি লোলাকে জাপ্টে ধরলাম। তার গোপন লোমের নাগাল পেতেও আমার দেরী হলোনা। হ্যাঁ, এই সেই হাতে বোনা কম্বল, যা আমি সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম বাথরুমের কী-হোলে চোখ রেখে।

হঠাৎ প্রচণ্ড ধমকে চমকে উঠলাম আমি। চমক ভাঙ্গতে দেখি, লোলা আমার কান ধরে আছে এবং বলছে—ফ্লাইয়ের বোতাম লাগা ডেঁপো ছোকরা!

আবার আমি গিয়ে বসলাম পিয়ানোর সামানে। কিন্তু আপনারাই বলুন, এ অবস্থায় সঙ্গীত-চর্চা সম্ভব? লোলা কট মট করে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝেই। আমি অগত্যা রীড টিপতে থাকলাম

সুবোধ বালকের মতোই। আমার ভয় করছিলো, যদি কথাটা ও মার কাছে বলে দেয়! সৌভাগের ব্যপার এসব কথা অন্যের কাছে বলা সহজ নয়।

ভেবেছিলাম, লোলা আমাকে গান শেখাবার পাট চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু তার বদলে আমি দেখলাম, আরো সাজগোজ করে সে আসছে আমাকে তালিম দিতে। পারফিউম আরো বেশি বেশি করে ছড়াচ্ছে শরীরে। ওর ভাবসাব যেন কীরকম কীরকম। কিন্তু আমি আর আমার প্যান্টের বোতাম খোলবার সাহস পাই না। যদিও বুঝতে পারতাম, গান শেখাবার সময় সে চকিতে আমার কোন্ জায়গাটা দেখে নিচ্ছে। আমার বয়েস তখন বোধ হয় পনেরো টনেরো হবে। আর ওর বয়েস পঁচিশ থেকে আঠাশের মধ্যে। এ অবস্থায় কী করা যায়—তা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। তবে আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। আমি ওৎ পেতে রইলাম সুযোগের অপেক্ষায়। লোলার একটা অভ্যেস ছিলো সন্ধের দিকে বেড়াতে বেরুবার। আমি একদিন ওর পিছু লাগলাম। মনে হলো গোরস্থানের ওদিকটাতেই সে যায়। পুলকিত হলাম আমি। কেননা ওখানে ওকে পেড়ে ফেলা আমার পক্ষে খুব একটা অসুবিধে হবে না। এইভাবে অনেক দিন ওকে ফলো করেও ফলোদয় হয়নি। তবে কিনা, ওকে অনুসরণ করার সময় প্রায়শ আমার মনে হতো, এই যে আমি ওর পিছু লেগেছি, ব্যাপারটা বোধহয় ও জানে। মজাটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। মনে হতো, এতে ওর তেমন কোনো আপত্তিও নেই!

সেদিন মারাত্মক গরম পড়েছে। আমি রেললাইনের ধারে একটা মাঠের মধ্যে চিৎপাত শুয়ে হাঁসফাঁস করছিলাম। তখন আমার মনে একবারও আসেনি লোলার চিন্তা। ওরকম গরমে একমাত্র গরম ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা করাও অসম্ভব। ঘাসের ওপর পড়ে আছি বিধ্বস্ত অবস্থায়, হঠাৎ আমার চোখে পড়লো, একটা মেয়ে এদিকেই হেঁটে আসছে আলো-আঁধারিতে। আছি এখানে একাই আমি। এমনকি আমার ধারে কাছেও কোন লোক নেই। দেখলাম শ্লথ পায়, মাথা নিচু করে মেয়েটি এগিয়ে আসছে এই দিকেই। মনে হয় স্বপ্নাতুর সে। কাছাকাছি আসতেই মেয়েটাকে আমি চিনে ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে ডেকেও উঠেছি—

: লোলা!

আমাকে এরকম জায়গায় এভাবে দেখে সে সত্যি খুব অবাক হয়ে গেছে বলে মনে হলো।

এখানে কি করছো?—জিজ্ঞেস করলো সে আমাকে। এবং জিজ্ঞেস করতে করতেই যেন সে আমার পাশে বসে পড়লো। আমি কোন জবাব দিলাম না তার প্রশ্নের। একটি শব্দও উচ্চারিত হলো না আমার মুখ থেকে। আমি কেবল উঠে, তার পাশে বসে তাকে সটান শুইয়ে ফেললাম ঘাসের ওপর।

এখানে না, এখানে না প্লিজ!—কাতর গলায় বললো লোলা। কিন্তু আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি তার দু'পায়ের ফাঁকে হাত চালিয়ে দিলাম বিদ্যুত-বেগে। সে রস ছাড়তে শুরু করেছিলো ইতিমধ্যেই। আমার আঙুল ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেলো মুহূর্তে।

এটাই ছিলো আমার প্রথম সঙ্গম। ঘটনাটি আরো এক কারণে স্মরনীয় যে, সে সময় একটা ট্রেন লাইনের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছিলো। অল্পের জন্যে ইঞ্জিনের ফুলকি এসে আমাদের গায়ে লাগেনি। লোলা তো ভয়ে একদম সিঁটিয়েই গিয়েছিলো। কিন্তু এটা ছিলো তার জীবনেরও প্রথম সঙ্গম। ধর্ষণ করার সময় যা বুঝছিলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছিলো, ব্যাপারটা আমার চেয়ে তারই ছিলো বেশি দরকার। কিন্তু ইঞ্জিনের ফুল্‌কি দেখে আমার নিচ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে কি তড়পানি তার। আমি এমনভাবে তাকে জাপ্টে ধরেছিলাম, মনে হচ্ছিলো একটা বন্য-ঘোটকী সামলাচ্ছি। সবকিছু শেষ হলে লোলা হঠাৎ বললো, শিগগীর বাড়ি যাও! আমি জবাব দিলাম—কিছুতেই যাচ্ছিনা! তারপর লোলার হাত ধরে আমি হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। আমরা একদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দু'জনের কেউই জানিনা, গন্তব্য কোথায়?

শেষে বড়ো রাস্তা থেকে খানিকটা তফাতে একটা পুকুরের পাড়ে এলাম আমরা। দু'দিকে ডালপাতা ছড়ানো গাছ। মাঝখানে কাঁচা রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে আমি খানিকটা এগিয়ে এসেছি—হঠাৎ লোলা আমাকে আঁকড়ে ধরলো। তারপর আমাকে সুদ্ধ গড়িয়ে শুয়ে পড়লো পথের ওপর। আমি ওর ওপর প্রায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়লাম। তারপর আমার প্যান্টের ভিতরে ওর একটা হাত নিয়ে গেলাম। ওর হাতের মুঠোয় আমার লিঙ্গ। মৃদু মৃদু আদর করছে সে। কিছুক্ষণ পর সে নিজেই তার যোনির ভেতর সেটাকে

চমৎকার ভাবে ঢুকিয়ে দিলো। আমার অবস্থা তো বলাই বাহুল্য। চালিয়ে দিলাম পুরোদমে। এক পর্যায়ে সে তার পা দুটি দুদিকে ছড়িয়ে দিলো। আমি এখন স্বর্গ রাজ্যের তোরণে। প্রায় উন্মাদের মতো আমি তার গোপন লোমের প্রতিটিতে একটি করে চুমো খেলাম। তার নাভির মধ্যে জিহবা ঢুকিয়ে দিলাম এবং চেটেপুটে সাফ করে ফেললাম সেখানকার প্রতিটি ধুলিকণা। অনেকক্ষণ পর যখন তার যোনি ফোয়ারার মতো রস উগ্‌রে দিলো, আমি অন্ধের মতো আমার মুখ ডুবিয়ে দিলাম সেই সরোবরে। কামার্ত গুঞ্জণে সে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলো। তার চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো স্তনের ওপর। বস্তুতঃ আমরা দু'জনেই ছিলাম বাহ্যজ্ঞান শূন্য। অনেক রাতে বাসায় ফিরেছিলাম একটা ঝোড়ো কাকের মতো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রমাণ পেলাম আমি। যা ছিরি হয়েছে কাপড় চোপরের। ওহ্, ভাবা যায়না।

বারো

লোলার সঙ্গে লেপ্টে ছিলাম অনেকটা সময়। যতোদিন ছিলাম, চমৎকার ছিলাম। কিন্তু বেশি দিন চালানো গেলোনা। মাস খানেকের ভেতরে ওরা চলে গেলো অন্য শহরে। আমি লোলাকে আর কোনো দিনও দেখিনি। কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকেই

সঙ্গীতে আমি পেতাম কাম-গন্ধ! পিয়ানো বাদনকে মনে হতো যৌন-সঙ্গম। সঙ্গীত আর সঙ্গম এক দেহে একাকার!

এই বোধটা আমাকে কুরেকুরে খেয়েছে আরো অন্ততঃ দুটি বছর। এর পর একটা বড়ো মাপের ছ্যাঁক খেলাম। তাছাড়া সময়টা গ্রীষ্ম ছিলোনা। এবং আমাদের পিঠের নিচে ছিলোনা কোনো ঘাসের অস্তিত্ব। আর তাপ বা উষ্ণতা? না মোটেই ছিলোনা। বরং একে বলা চলে শীতল-সঙ্গম। এবং যান্ত্রিক তো বটেই। নোংরা হোটেলের একটি খুপড়ির মতো রুমে সে ছিলো এক বিরক্তিকর যৌনাচরণ। আমি আর আমার এক বন্ধু পাশাপাশা দু'টি কক্ষে দু'টি মেয়েকে করতাম। কিন্তু কেঠো-যোনির ঠাণ্ডা মেয়েটার সঙ্গে আমার রতিক্রিয়া হতো খুবই অল্পক্ষণের। আমি মেয়েটার ওপর থেকে উঠেই চলে যেতাম পাশের রুমে, যেখানে ওরা দু'জন দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটা চেক। বেশ টাটকা। অল্পদিন হলো এ লাইনে এসেছে। ফলে মজাও আছে লাগিয়ে। বন্ধুর শেষ হলে আমি ঐ চেক মেয়েটিকে করতাম। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ওর কাছ থেকেও একটা ছ্যাঁক খেতে হলো আমাকে।

পরের একটি বছর নিজেকে তালিম দিলাম আমি। এবং ভাগ্যই বলতে হবে, আমার গানের ছাত্রীর মায়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো আমার। সে যে আসলে একটা নিগ্রোর সঙ্গে বসবাস করে তা আমি পরে টের পাই। মনে হচ্ছিলো, কালো লোকটা ওকে পুরো তৃপ্তি দিতে পারছিলো না। যাই হোক, মেয়েকে গান শিখিয়ে ফেরার পথে একদিন সে আমাকে করিডোরের মধ্যে জাপ্টে

ধরেছিলো। এবং আমার নুনু ওর যোনির মধ্যে ঠেসে ধরেছিলো। তারপর থেকেই সমানে চললো। কিন্তু আমার একটা ভয় ছিলো। বলাবলি হতো, তার সিফিলিস আছে। কিন্তু ওই রকম হাভাতে কুত্তিকে যখন তুমি লাগাও এবং সে যখন তোমার লিঙ্গটি মুখে নিয়ে চুষতে থাকে তখন ওসব সিফিলিস টিফিলিসের কথা কি খেয়াল থাকার কথা? তাকে বারন্দায় দাঁড়িয়ে লাগাতেও কোনো অসুবিধে হতো না আমার। কেননা তার গড়নটা ছিলো হালকা পলকা— অনেকটা পুতুলের মতো।

যাই হোক একদিন রাত্রে আমরা মউজ করছি হঠাৎ দরজার কী-হোলে একটা চাবি ঢোকাবার শব্দ পেলাম বাইরে থেকে। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো সে। আত্ম গোপন করার মতো কোনো জায়গা নেই। ভাগ্যক্রমে বন্ধ দরজায় টাঙানো একটা পর্দার আড়ালে আমি নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলাম। একটু পরে আমার কানে এলো চুমোর আওয়াজ। কালামিয়া সশব্দে আমার গানের ছাত্রীর মায়ের গালে চুমো খাচ্ছে এবং বলছে, 'ভালো আছো তো হানি! আর মেয়েটি জানাচ্ছে সে তার জন্যে কতোই না কাতর ভাবে অপেক্ষা করছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি। ওপর তলায় ওদের শোবার ঘর। অল্পক্ষণের মধ্যেই দু'জনে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপর তলায় চলে গেলো বলে মনে হলো আমার। আর কি আমি দেরী করি! দরজা খুলে দে—চম্পট। ঘাম দিয়েই যেন জ্বর ছাড়লো আমার। বাপ্‌স! ব্যাটা নিগারটা আমাকে ধরতে পারলে নির্ঘাত গলা কাটতো। এতে কোনো ভুল নেই। আমি গানের

মাস্টারীটা ছেড়েই দিলাম একদিন।

লেকিন কম্‌লি নেহী ছোড়্‌তা। আমার ছাত্রী এসে আবার পাকড়াও করলো আমাকে। স্যার, আমাকে পড়াতে হবে। আমাদের বা আপনার বাসায় অসুবিধে হয়—আমার কোন বন্ধুর বাড়িতেই না হয় শেখান। মেয়েটি পনেরো পেরিয়ে ষোলয় পড়েছে। আমি না বলি কোন মুখে! আমি তাকে সবক দিতে শুরু করলাম। কেবল সঙ্গীত বিদ্যাই নয়, শরীরের বিদ্যাতেও। টাটকা যোনির গন্ধই আলাদা। আর স্বাদটাও সম্পূর্ণ অন্য রকম। এবং ওইভাবে চালিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ বজ্রপাত। মেয়েটির পেট হয়ে গেলো। এখন উপায়? এ ব্যাপারে আমার উপদেষ্টা হিসেবে এগিয়ে এলো ইহুদী ছোকরা। তবে এজন্যে সে দাবি করলো পঁচিশ টাকা। আমি তখনো পঁচিশ টাকা একত্রে দেখিনি। তাছাড়া মেয়েটিও অপ্রাপ্ত বয়স্কা। গর্ভপাতের কারণে রক্ত দূষিত হবার আশঙ্কা ষোলো আনা। আমি ছোকরাটাকে পাঁচ টাকা দিলাম। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বৈতরনী পারও করে দিলো সে আমাকে।

ছুটির দিনে চারদিকে আমি ছড়াছড়ি দেখ্‌তাম যোনির। আমি সারা বছর তীর্থের কাকের মতোই অপেক্ষা করতাম এই সময়টার জন্যে। না, যোনির কারণে নয় এ সময়টায় কাজের ঝামেলা থাকে না বলে। ওহ্ কী স্বাধীন কি মুক্ত জীবন। মনে হতো, গায়ের চামড়া ছিড়ে দেহটা বাইরে বেরিয়ে উড়ে যাবে!

এক গ্রীষ্মের কথা মনে পড়ে। ফ্রানসি নামের এক স্কচ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার। মেয়েটার দাঁতগুলো ছিলো ঝকমকে সাদা।

যেন ঝিলিক মারতো। তা ঘটনা একটা ঘটে গেলো সাঁতারাবার সময়। আমি সাঁরাচ্ছি; হঠাৎ পাশের নৌকা থেকে পা ফস্‌কে মেয়েটা পড়ে গেলো পানির মধ্যে। তার পায়ের সঙ্গে আমার পা ঠোকাঠুকি হতেই দুজনের মধ্যে দ্রুত ভাব বিনিময় ঘটে গেলো। যেন আমরা ডুব-সাঁতার দিয়ে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে ছোয়াছুয়ি করতে লাগলাম পানির নিচে—যাতে কারো নজরে না পড়ে ব্যাপারটা।

নৌকার ওপর বসে থাকা অন্য মেয়েটা একটু বেজার হয়েছে মনে হলো। মেয়েটি রুগ্ন। চোখে তীব্র চাউনি। আমরা তার অভিমান ভাঙ্গাতে তাকেও পানির মধ্যে টেনে নামালাম। এবং তিন জনে খেলতে লাগলাম ডলফেনের মতো। কিন্তু ওই ঠোকাঠুকি পর্যন্তই। ওদেরকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছিলো না—কেননা দু'জনেই বারবার পিছলে পিছলে যাচ্ছিলো বায়েন মাছের মতো। সাঁতরে সাঁতরে ক্লান্ত হবার পর আমরা তিন জন তীরে উঠে এগিয়ে গেলাম বাথ-হাউসের দিকে। সাঁতারুদের বিশ্রাম নেবার ঘরটা ছিলো একটা মাঠের মধ্যে। দেখতে অনেকটা পুলিশ—ঘেরাটোপের মতো। কী? না, তিনজন মানুষ এমন একটি ঘরের মধ্যে পোষাক পরবে! ভাবুন একবার ব্যাপার খানা।

প্রচণ্ড গরম পড়েছে। কেমন একটা গুমোট, দমবন্ধ করা ভাব চারদিকে। আকাশে মেঘ জমেছিলো ঘন হয়ে। মনে হচ্ছিলো, ঝড় আসতে আর দেরী নেই। ফ্রান্সির বন্ধু অ্যাগনেস তাড়াহুড়া করে পোশাক পরছিলো। নগ্ন অবস্থায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে তার লজ্জা করছিলো বলে মনে হলো। কিন্তু ফ্রানসি এসব ব্যাপারে বেশ

স্বাভাবিক। সে ন্যাংটা পুটুং হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে, একটা বেঞ্চে বসে সিগারেট টানছিলো নির্বিকারে। যাই হোক, অ্যাগনেস যেই তার শেমিজটা পরতে যাবে—হঠাৎ বিদ্যুত চমকালো আকাশ চিরে। সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছেই কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। অ্যাগনেস আর্থনাদ করে হাত থেকে ছেড়ে দিলো শেমিজটা। পর মুহূর্তে আবার বজ্রপাত। এবার আরো কাছাকাছি। আমরা সবাই বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। বিশেষ করে অ্যাগনেসটা এতো বেশি ঘাবড়ে গিয়েছিলো যে সে তল্পি তল্পা গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি নিলো। আর যেই না সে তার কাপড় চোপর গুটিয়ে বুকের কাছে নিয়ে তৈরী হয়েছে—মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো।

আমরা ভেবেছিলাম বৃষ্টি শিগগীরই থেমে যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর মনে হলো, না, এ সহজে যাবার নয়। বৃষ্টি ক্রমশ তুমুল আকার ধারণ করছে। সেই সঙ্গে চলছে বিদ্যুচ্চমক আর বজ্রপাত। অ্যাগনেস দু'হাত জোড় করে চড়া গলায় প্রার্থনা করতে শুরু করলো। আমি ভাবলাম, ভয়ে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে না পড়ে। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। পরিবেশটাকে সহজ করার ইচ্ছায় আমি আমার পুরানো পদ্ধতিটা প্রয়োগ করবো বলে ভাবলাম। আমি সাধারণতঃ ভীতু হলে হেসে উঠে ভয় তাড়াতে চেষ্টা করি। যাই হোক, আমি এক দৌড়ে বাইরে বেড়িয়ে রক্ত জল করা এক দানবীয় অট্টহাসি হেসে উঠলাম। আমার এই বন্যহাসিতে মেয়ে দু'টো চমকে উঠলো একসঙ্গে। বৃষ্টির ছাট আমার চামড়ায় বিধছিলো সূঁচের মতো। নিজেকে মনে হচ্ছিলো পালকের চেয়েও পল্‌কা

এমন কি বাতাস, ধোঁয়া আর ম্যাগনেশিয়ামের থেকেও অনেক হালকা। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ-চমক এবং মুহু-মুহু বজ্রপাতের মধ্যে আমি তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিলাম। আমার নাচের মুদ্রাটি বিচিত্র। এবং স্বরচিত তো অবশ্যই। আমি এক হাতের তেলোয় ধরেছি আমার অণ্ডকোষ—অন্য হাতে চেপে ধরেছি আমার নাক। ফ্রান্‌সি আর অ্যাগনেস দু'চোখ বড়ো বড়ো করে আমার উদ্দাম নৃত্য দেখতে লাগলো।

বৃষ্টির দাপটে মাঠের ঘাসগুলোকে মনে হচ্ছিলো অজস্র সঞ্চরণশীল মৌমাছির মতো। আমি হঠাৎ ক্যাঙারুর মতো লাফাতে শুরু করলাম। গলায় যতো জোর আছে—চেঁচিয়ে বলতে লাগলাম—'হে পিতা, হে বুড়ো কুত্তার বাচ্চা, হে বানচোত—তোমার বাজ-বিদ্যুত থামাও। নইলে অ্যাগনেস আর তোমার ওপর বিশ্বাস রাখবে না। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? বাবা হে,—তুমি কি বদ্ধ কালা?' এইসব প্রলাপ বকতে বকতে এবং লাফ ঝাঁপ করতে করতে বাথ হাউসের চারদিক বেড় দিয়ে আমি ঘুরপাক খেতে লাগলাম। যেই আবার বিদ্যুৎ চমকালো আমি লাফিয়ে উঠলাম। এবং বাজপড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি সিংহের মতো গর্জন করলাম। তারপর এঁড়ে বাছুরের মতো খানিকক্ষণ ঘাস চিবিয়ে গরিলার মতো বুক চাপড়াতে শুরু করলাম। আমার চোখে তখন উঠা-নামা করছে পিয়ানোর রিড—নাচছে স্বরলিপির সাদা পাতা। আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে আবার চীৎকার করতে থাক-লাম মুখখিস্তি করে।

কিন্তু আমার এসব কীর্তিকাণ্ডে অ্যাগনেস যে খুব একটা স্বস্তি পেয়েছে এরকম মনে হলো না। বরং হঠাৎ সেই বধির আইরিশ ক্যাথলিক নদীর দিকে ছুটতে শুরু করলো। আমি ছিলাম নৃত্য-মত্ত—প্রথমটায় খেয়াল করিনি। ঠাহর হলো, যখন ফ্রানসি চেঁচিয় উঠলো—'ওকে ধরো, ওকে ধরো ওকে ফিরিয়ে আনো ও নির্ঘাত ডুবে মরবে। আত্মঘাতী হবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম অ্যাগ-নেসের পেছনে পেছনে। বৃষ্টি ঝরছিলো অবিরল ধারায়। ও দৌড়ে যাচ্ছে। আমি দু'হাত মুখের কাছে এনে চেঁচিয়ে ডাকলাম অ্যাগনেসকে। বললাম ফিরে আসতে। কিন্তু সে তখন ছুটছে অন্ধের মতোই। ছুটতে ছুটতে সে নদীতে নয়—লাফ দিয়ে উঠলো নৌকায়। আমি সাতার দিয়ে নৌকাটা ধরলাম এবং লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম পাটাতনে।

ওর ভাব গতিক আমার কাছে মোটেই সুবিধের মনে হলো না। আমি আলতো ভাবে ওর দু'হাত ধরে শান্ত গলায় কথা বলতে শুরু করলাম। যেন একটা শিশুর সঙ্গে কথা বলছি।

দূর হও!' —অ্যাগনেস বললো—'সরে যাও আমার কাছ থেকে—। নাস্তিক কোথাকার!'

এতক্ষনে আমি বুঝলাম তার এই বিকার আসলে আমার কারণেই। আমি একটু আগে আকাশের দিকে হাত তুলে যে আবোল তাবোল প্যাচাল পেড়েছি—এ তারই ফলশ্রুতি। বাপ্‌রে, যা-তা ব্যাপার নয়—আমি অপমান করেছি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এবং অন্য কোন উপায় না দেখে—

অ্যাগনেসকে শান্ত করবার জন্যে নিজের দোষ স্বীকার করলাম। বললাম আরে, ও তো আমি ফাজলামো করছি! আরো বললাম, তবু আমি এইসব আবোল তাবোল বকবক করার জন্যে অনুতপ্ত। —বলতে বলতে হাত ছেড়ে দিয়ে ওর পাছায় আলতো করে একটা টোকা দিলাম। সে আসলে এটাই চাইছিলো। আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলো, সে কতোটা সৎ ক্যাথলিক এবং পাপ থেকে কীভাবে দূরে থাকতে চায়। কাজেই আমার ওই সব বিদঘুটে কথাবার্তা ভাবচক্কর তার একটুও পছন্দ হয়নি।

আমি ততোক্ষণে সাধু বনে গেছি একেবারে। যতো রাজ্যের সৎ কথা বলতে বলতে আমি তার তলপেটে হাত দিলাম। ধর্ম, ঈশ্বর এবং ভালোবাসা সম্পর্কে বাছা বাছা গৎ আউড়ে আমি ওকে জানিয়ে দিলাম আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তার কথা—এমনকি আমার গির্জায় যাতায়াতের সুসমাচারও! লক্ষ্য করলাম, এক ধরণের মুগ্ধতা নিয়ে সে সব কথা যেন গোগ্রাসে গিলছে অ্যাগনেস। সে এতোটাই তদ্‌গত হয়ে আমার আদর্শের বুলি গিলছিলো যে, বক্তিমে দিতে দিতে আমি তার যোনির মধ্যে তিনটে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেও সে কোনরকম আপত্তির আভাস দিলো না।

ঃ আমাকে জড়িয়ে ধরো অ্যাগনেস।'—আমি নরম গলায় বললাম। বলতে বলতে যোনির ভেতর থেকে তিনটে আঙুল বের করে ওকে পাটাতনের ওপর শুইয়ে দিয়েই, ওর ওপর শুয়ে পড়লাম।

ঃ এই, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। এই ভাবে। এই একটু খানি। এ কিছু না। যতো রাজ্যের ধর্মের কথা, ঈশ্বরের মহিমার কথা

এবং শপথের কথা বলতে বলতে আমি ওকে কায়দা করে ফেললাম।
ঃ তুমি কতো ভালো!—গাঢ় স্বরে বললো অ্যাগনেস। যেন সে আদৌ জানেনা, আমার কোন্ জিনিসটা তার কোন্ জিনিসের মধ্যে ইতি মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আমি মস্ত বড়ো আহাম্মুকি করেছি তখন। তুমি যাই বলো! —আমি অনুতাপের স্বরে উচ্চারণ করি। তারপর আরো একটু ঘনিষ্ঠ গলায় বলি—হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো, এই রকম—এইভাবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। অ্যাগনেস, আমাকে আরো একটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরো না। হ্যাঁ হ্যাঁ এই রকম ভাবে!···
ঃ নৌকাটা আবার উল্টে না যায়।—চিন্তিত স্বরে বললো অ্যাগনেস। আশ্চর্য, সে ধর্ষিত হতে হতেও এক হাতে দাঁড় টানছিলো! আমি বললাম, 'চলো না হয় পাড়েই গিয়ে উঠি। সেখানেই যাহোক··· এটুকু বলে যেই না আমি একটু নড়ে উঠছি, অ্যাগনেস আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললো—'আমাকে ফেলে যেয়োনা, আমাকে ছেড়ে দিয়োনা, আমি পড়ে যাবো।' বলতে বলতে সে আমাকে নিবিড়ভাবে ঠেসে ধরলো তার নরম তুলতুলে বুকের সঙ্গে। ঠিক তক্ষুণি মূর্তিমতী রসভঙ্গের মতোই ঘটনাস্থলে ফ্রানসির আবির্ভাব। ফ্রানসি দৌড়ে আসছিলো নৌকার দিকে। আর অ্যাগনেস তখন জড়ানো গলায় বারবার বলছে: আমাকে ধরো, আমাকে ধরো, আমি ডুবে যাবো!
ফ্রানসি চমৎকার মেয়ে—আমি একশো একবার একথা বলবো। সে অবশ্যই কাথলিক নয়। মূলত সে ছিলো এমনি এক মেয়ে,

যাদের জন্মই হয়েছে সঙ্গমের জন্যে। তার কোন মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো না। ছিলোনা কোনো আকাঙ্খা, হিংসা এমনকি অভিযোগও। সে ছিলো সদা-আনন্দময়ী এবং বুদ্ধিহীনা অবশ্যই নয়। অন্ধকার রাত্রে আমরা যখন বাড়ির সামনে আত্মীয়-কুটুম্ব কিংবা পাড়া পড়শিদের সঙ্গে গল্প সল্প করতাম, তখন সে আমার কোলে এসে বসতো পাছা উদ্‌লা করে। তার গায়ে জামা থাকতো ঠিকই কিন্তু —পরণে কিস্‌সু না। সে যখন অন্যদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে হাসি মস্করা গল্প গুজব করছে—আমি তখন ওটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছ জায়গা মতো। শহরে ফিরে, খবর পেয়ে হয়তো ওর বাসায় গিয়েছি—ও একই কাণ্ড করলো মায়ের সামনে, যিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। নাচতে গিয়ে ও যখন বেশি গরম হয়ে যেতো—টানতে টানতে আমাকে নিয়ে ঢুকতো কাছাকাছি কোন টেলিফোন-বুথে। বস্তুত লোকের নাকের ডগায় কুকর্ম করে ফ্রানসি এক ধরণের আমোদ পেতো। এ ব্যাপারে তার অভিমত হলো, এ কাজে তুমি অনেক বেশি আনন্দ লাভ করবে যদি একে খুব সহজভাবে নাও। ধরা যাক, সমুদ্র তীর থেকে শহরে ফিরে ভীড়ে-ভীড়াক্কার সাব-ওয়ে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছি। হঠাৎ সে তার পোষাকের মাঝা-মাঝি জায়গায় আমার হাতটা টেনে নিয়ে আমার আঙুল ঢুকিয়ে দিলো তার পুষির মধ্যে। কিংবা বাহুড়-ঝোলা ট্রেনে কোথাও দু'জনে একসঙ্গে চলেছি। সে দম বন্ধ গাদাগাদি ভীড়ের মধ্যেও হয়তো আমার ফ্লাই খুলে সে দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে নিলো আমার নুনু। যেন পাখির বাচ্চা ধরে রেখেছে অঞ্জলিতে। মাঝে-

মধ্যে অবশ্য সাবধানতা হিসেবে ঘটনাস্থলের ওপর একটা ব্যাগ ফেলে রাখতো, যাতে কারো নজরে না পড়ে!

আর একটি ব্যাপারে সে অকপট ছিলো যে, আমিই ওর একমাত্র যৌন-সঙ্গী নই। ওর ভেতরের সমস্ত কথা—আকাম কুকামের যাবতীয় ফিরিস্তি আমার সামনে ও পেশ করতো খুব সহজ, স্বাভাবিক ভাবে। সে যখন আমার ওপর চড়াও হয়েছে, আমি যখন ওকে লাগাচ্ছি—কিংবা ওর যখন 'বেরিয়ে আসছে'—তখনও সে অন্যের সঙ্গে নিজের কায়কাবারের বিবরণ দিয়ে চলতো। কবে সে কার সাঙ্গ কী কী করলো, তা এমন বিশদ ভাবে আমাকে শোনাতো—যেন আমি এই বিষেয়র ওপর একটা পাঠ্য বই লিখতে যাচ্ছি। বস্তুতঃ নির্বিকারে সমস্ত তথ্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে ওর জুড়ি ছিলোনা।

ঃ ফ্রান্সি, তুমি কেবল ওটাই বোঝো। কেবল ওই সমস্তই। যেন দুনিয়াতে মানুষের আর কিছু করবার নেই। কোনো নীতি বোধ নেই তোমার, পচা মাগি কোথাকার! —আমি বলতাম।

ঃ কিন্তু তুমি আমাকে পছন্দ করো! —করোনা? —সে জবাবে বলে—'পুরুষরা লাগাতে পছন্দ করে—মেয়ের করবে না কেন বলো?' এতে তো কারো কোনো ক্ষতি হয়না। এরকম কোনো নিয়মও এখানে নেই যে, যাকে যাকে তুমি লাগাবে, তাদের সব্বাইকে তোমার ভালো বাসতে হবে! আমি চাই না কেউ আমাকে ভালোবাসুক। একই লোক চিরকাল লাগাবে—মা গো মা—ভাবতেই গা-টা শিউরে উঠে আমার। তোমারও কি খারাপ লাগেনা একথা চিন্তা করতে? শোনো, তুমি যদি অন্যদের তফাতে

রেখে কেবল আমাকেই অনবরত করতে থাকো তবে শিগগীরই আমার ওপর ঘেন্না এসে যাবে তোমার। এক ঘেয়েমী জন্মাবে। জন্মাবে না? মাঝে মাঝে এমন মানুষের কাছে ধর্ষিত হওয়া দরকার যে বিলকুল অচেনা। হ্যাঁ আমার মনে হয়, এটাই সবচে ভালো। এখানে নেই কোনো ধানাই পানাই, নেই টেলিফোন-নম্বর, নেই প্রেমপত্র—কিস্ সুটি না। শোনো, তোমার কি মনে হয়ে, এটা খুব খারাপ! আমি একবার আমার ভাইটাকে একটু টেস্ট্ করতে চেয়েছিলাম। তুমি তো জানোই—সে কেমন লালটু মার্কা? কিন্তু এটা বোধ হয় জানোনা, অন্যকে আঘাত দেওয়াতে তার কীরকম বিমল আনন্দ? সেবার সবাই বাইরে গেছে। বাড়িতে কেবলও আর আমি। সেদিন আবার আমি ছিলাম খানিকটা আবেগাক্রান্ত। সে আমার ঘরে এসে কি যেন একটা দিতে বললো। আমি তখন আলুথালু পোশাকে শুয়ে আছি। যৌন-সঙ্গমের জন্যে কাতর হয়ে পড়েছিলাম আমি এবং ক্ষ্যাপার মতোই ছটফট করছিলাম। সে যখন আমার ঘরে এসে ঢুকলো, তখন তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, সে সব চিন্তা চুলোয় গেলো। আমার ভাই নয়, আমি তখন তাকে ভাবলাম একজন পুরুষ হিসেবে। স্কার্ট এলোমেলো রেখে আমি তেমনি শুয়েই রইলাম এবং ওকে বললাম, আমার ভালো লাগছে না। পেট ব্যথা করছে। একথা শুনেই সে সম্ভবত ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যে পা বাড়ালো।

আমি তাকে বললাম, ওসব কিছুই লাগবে না। বরং সে যদি আমার পেটটা একটুখানি ডলে দেয়, ভালো হয়। আমি ওর

হাতটা এনে আমার তল পেটের ওপর রাখলাম এবং তা ঘষতে লাগলাম নগ্ন চামড়ার ওপর। কিন্তু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে গবেটটা এমন ভাবে আমার তলপেট টিপতে লাগলো, যেন এক টুকরো কাঠ নাড়াচাড়া করছে।

ঃ ওখানে নয়। --আমি বললাম। আমার এই নিচের দিকটাতে ব্যথা করছে। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? বলে আমি ওকে আসল জায়গাটাই দেখিয়ে দিলাম এবার। আর সে-ও সেইখানেই স্পর্শ করলো। আমি চীৎকার করে বললাম—হ্যাঁ এই জায়গায়, এই জায়গায়। টিপে দাও, টিপে দাও! ওহ্ যা ভালো লাগছে আমার। ...জানো--ফ্রানসি আমার দিকে তাকিয়ে এবার বললো, 'পাঁচ মিনিট টিপবার পরও গবেটটা আঁচ করতে পারেনি, কেসটা কি? আমি এতোই হতাশ হয়ে পড়লাম যে, তাকে বেরিয়ে যেতে বললাম আমার রুম থেকে। বললাম, তুমি একটা নপুংসক। কিন্তু ছেলেটা এমন হাবা ছিলো যে ওই শব্দটার অর্থ সে জানে কিনা সন্দেহ। --বলতে বলতে হেসে উঠলো ফ্রানসি। আমি চিন্তিত গলায় বললাম, তুমি যাদের সঙ্গে শোও—সবাইকে কি একথা বলেছো? মাথা নেড়ে ও জানালো—না!

ঃ একথা কউকে বললে ও তোমাকে পিটিয়ে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে! আমি বললাম।

ঃ সে আমাকে পিটিয়েছে। বললো ফ্রানসি।

ঃ কী? তুমি পিটুনি খেলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

সে বললো, আমি তো আর তাকে মারতে বলিনি। কিন্তু তুমি

তো জানো, কী রকম চট করেই সে রেগে যায়? কেউ আমাকে মারধোর করুক, তা অবশ্য আমি চাইনা। কিন্তু মাঝে মাঝে ওর হাতে পিটুনি খেতে আমার নেহাৎ খারাপ লাগেনি। উপরন্তু কখনো কখনো আমি ভিতরে ভিতরে খুশিই হয়ছি। আমি ঠিক জানিনা, তবে মাঝে মধ্যে মেয়েদের মার খাওয়া বোধহয় মন্দ নয়। এটা খুব একটা ক্ষতি করেনা—যদি যার হাতে মার খাচ্ছো তাকে আপন বলে ভাবো। মারবার পর পরই সে যা সুন্দর করে—আমি তো রীতিমতো লজ্জিত হয়ে পড়ি।

তেরো

ধরা যাক ট্রিক্স মিরাণ্ডা আর তার বোন মিসেস কস্টেলোর কথাই। দু'টি বোন তো নয় যেন সুন্দর এক জোড়া পাখি। ট্রিক্স মিশতো আমার বন্ধু ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে। কিন্তু সে তার বোনকে বোঝাতো যে এটা স্রেফ নির্মল মেলামেশা—কাম গন্ধ নাহি তায়! কোনো যৌন সম্পর্ক নেই ওদের মধ্যে।

মিসেস কস্টেলো ছিলো ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তার দেহের গড়ন ছিলো বেঁটে মতো। হাবভাবে সন্দেহ করাও সম্ভব ছিলো না যে কারুর সঙ্গে তার আবার সম্পর্ক থাকতে পারে। এই রামনীর সঙ্গে পিরিত করবে কে? কিন্তু হায়, আমার বন্ধু ম্যাকগ্রেগর তাকেও লাগাতো হরদম। অর্থাৎ সে যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হতো দু'বোনের

সঙ্গেই। দু'বোনেই ব্যাপারটা জানতো। কিন্তু এক সঙ্গে বসবাসে তাদের কোনো বিপত্তি ঘটেনি তাতে। কী করে এটা সম্ভব হয়েছিলো কে জানে। ব্যাপারটা কোনোদিনই মাথায় আসেনি আমার।

কষ্টেলো কুত্তিটার আবার ছিলো ফিটের ব্যামো। যখনি সে আঁচ করতে পারতো, যে ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টিতে তার ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে—সে কপট মূর্চ্ছারোগে আক্রান্ত হতো। তার মানেই হলো, ওকে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে পাঁজাকোলা করে ওপর তলায় নিয়ে যাও এখন! ম্যাকগ্রেগর সেখানে ওর 'সেবা' করবে এবং 'ঘুম' পারিয়ে রাখবে মিরাণ্ডাকে। কোনো দিন দু'বোন উপভোগ করতো দিবানিদ্রা। ম্যাগগ্রেগর গিয়ে শুয়ে পড়তো তাদের পাশেই। ভাবখানা, তারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

দু'চোখ আধ বোঁজা অবস্থায় সে হাই তুলতো। তারপর দেখা যেতো সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘড়্ ঘড়্ শব্দে নাক ডাকছে তার। তারপর দু'বোনের একজন নিদ্রিত হলে ম্যাক তার চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করে দেখে নিতো, কে জেগে আছে। তার কপট-নিদ্রা ছুটে যেতো সঙ্গে সঙ্গে। সে 'বিনিদ্র' বোনের পাশে শোয়া 'বিনিদ্র' বোনকে সামাল দিতো। এসব ক্ষেত্রে সে অগ্রাধিকার দিতো মূর্ছা রোগিনী মিসেস কস্টেলোকেই। বেচারার স্বামী থাকতো দূরের কর্মস্থলে এবং স্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হতো ছ'মাস অন্তর অন্তর। যাই হোক, এই নাটকে ম্যাক যতো বেশী ঝুকি নিতো, মজা পেতো ততই বেশী। যেমন ট্রিক্সকে লাগাবার সময় সে এমন ভাব দেখাতো যে, ওর বোন টের

পেয়ে গেলে মহা হেনস্থা হবে। কিন্তু আসলে ওদের একজন আর একজনের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ুক, এটা সে কামনা করতো মনে প্রাণে। তবে হ্যাঁ, ওই বাঁটকুল বাম্‌নীটা ছিলো পাজির পা-ঝাড়া। ছোট বোনের কাছে ধরা পড়বার আগ মুহূর্তে সে মূর্ছা যেতো। ভাবখানা এই, ফিট হওয়া মেয়ে মানুষের ওপর কোন পুরুষ মানুষ কি 'হস্তক্ষেপ' করেছে তা মেয়েমানুষটার জানা থাকবার কথা নয়!

আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনতাম। কেননা আমার কাছে কিছু দিন ও গান শিখেছিলো। তাকে আমি বহুবার বুঝিয়েছি যে তার যোনিটা খুবই স্বাভাবিক মাপের। যৌন সঙ্গমে সুখ পেতে কোনো অসুবিধে নেই। আমি তাকে গরমাগরম গল্প বলতাম। একদিন কিঞ্চিৎ তরলিতা হয়ে সে আমাকে তার ছোট্ট ফুটোয় আঙুল ঢোকাতে দিলো। মাগির পুষিটা সত্যিই ছোট্ট—আর শুকনো খটখটে। কিন্তু তাতে কি? তাকে অনতিবিলম্বে মূর্ছাগ্রস্ত করতে আমার বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি। সে সচ্ছন্দে কাপড়ের বোঝা তুলে ফেলে বলতো, দ্যাখো, আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার শরীরের গড়ন ঠিক নয়! কেমন ঠিক বলিনি!

ঃ আমি তো সেরকম কিছু দেখিনা! —আমার জবাব।

বলতাম, একটু রাগ করেই বলতাম—তুমি আমাকে এরকম অনুবীক্ষণ লাগাতে বলো কেন, বলো দেখি?

আমার ভালো লাগে।—বলতো কস্টেলোগিন্নি।

তুমি যে তাহা মিথ্যুক, তাতে আর সন্দেহ কি? —আমি বলতাম।

—তুমি কি জানোনা, মেয়েমানুষ মাত্রেরই যোনি থাকে এবং মাঝেমধ্যে তা ব্যবহারও করতে হয়? তুমি কি চাও, সব সময় জিনিসটা শুকনো থাকুক!

: কী ভাষা! ভাষার ছিরি।—ঠোঁট উল্টে বলতো মিসেস কস্টেলো। তারপর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরতো 'লজ্জায়!' তার সারা মুখ লাল। —আমি ভেবেছিলাম, তুমি ভদ্রলোক? তার ক্ষোভের উচ্চারণ।

আর তুমি ভদ্রমহিলা! আমি সঙ্গে সঙ্গে যোগ করি।—এবং সেইরকম ভদ্রমহিলা, যারা যখন তখন অবৈধ সঙ্গম কামনা করেন এবং নিজেদের বক্ষে, অঙ্গুলি চালনা করে ভদ্রলোকদেরকে তাঁর গঠণ রীতির জরিপ করার অনুরোধ জানান।

: আমি কখনো তোমাকে আমার শরীর স্পর্শ করতে বলিনি! বললো মিসেস কস্টেলো। বললো—আমি কখনো বলিনি যে আমার গোপন অঙ্গে হাত বুলিয়ে দাও। আমি ডাক্তারকে যেমন দেখাতে হয়, তেমনি মানসিকতা নিয়েই—! তার কথা শেষ হবার আগেই আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম,—তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসছি যে, অতীতে এরকম কিছু ঘটেনি। এবং যা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে, তা আসলে ভুল। সে যাক, বলতে বলতে আমি মিসেস কস্টেলোক টেনে নিলাম কাছে এবং বললাম, ধরো তুমি আমার কোলে এভাবে এসে বসলে।—এবং আমি তাকে সত্যি সত্যি আমার কোলের ওপর তুলে নিলাম আলতো ভাবে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি খুব খারাপ লাগছে?

মিসেস কস্টেলো আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলো না। কিংবা আমার বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়া পাবারও কোন আগ্রহ দেখা গেলো না তার মধ্যে। সে বরং আরো একটু ঘেঁষে এলো আমার দেহের সঙ্গে। এবং চোখ বুঁজলো। শেষে খুব আস্তে আস্তে আমি হাত বুলোতে শুরু করলাম ওর পায়ের ওপর! খুব নিচু গলায় কথা বলতে আরম্ভ করলাম ওর সঙ্গে। আমি আমার হাতের আঙুল যখন ওর যোনি-দরজার দুটো পাল্লা আস্তে ফাঁক করলাম, সে ভেজা চাদরের মতো নরম হয়ে গেলো। আমি আস্তে আস্তে ওর যোনিটা ফাঁক করছি—হঠাৎ জায়গাটা ভিজে গেলো এবং ফুটোটার ভেতরে আমি চারটে আঙুল ঢুকিয়ে দিলাম। ভেতরে জায়গা ছিলো আরো। আমি ইচ্ছে করলে আরো বড়ো কিছু, বেশি কিছু জিনিস সেখানে ঢোকাতে পারি এখন!

চমৎকার যোনি! সুন্দর গোল ফুটো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, তখনো চোখ বুঁজে আছে সে। তার মুখ খোলা। কিন্তু চোখ বন্ধ! মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি। আমি এবার কিছুটা জোরালো ভাবেই তাকে আমার দিকে টানলাম। সামান্য প্রতিরোধের আভাস দেখা গেলো তার আচরণে। সে ছিলো পালকের মতো হালকা। সোফার শক্ত হাতলে মাথা ঠুকে গেলেও তার কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। যেন ধর্ষণ করার জন্যে তার ওপর অ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমি তার সমস্ত পোশাক খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম। সোফার ওপর কিছুক্ষণ কর্মরত থেকে আমি ওকে নামিয়ে আনলাম মেঝের ওপর

ওর পোশাকের বিছানায়। তারপর নুনুটা ওর যোনির ভেতর আবার ঢুকিয়ে দিলাম। আর সে তার মধ্যচ্ছদার মধুর উষ্ণতা দিয়ে আপ্যায়িত করতে লাগলো আমার শিশ্নকে।

রাত্রে বাইরে বেরুলে আমি একটা না একটা মেয়ে যোগার করে নিতামই। মেয়েটা হতে পারে নার্স, নাচের আসর থেকে ফেরা নাচুনী মেয়ে, একটা সেল্‌স-গার্ল—মোটকথা স্কার্ট পরা যে কোন কিছু। বন্ধু ম্যাকগ্রেগর এ নিয়ে আমাকে কতো ঠাট্টা তামাশা করেছে। কিন্তু আমি গায়েই মাখতাম না এসব। আমার মতো ওরও তো বাছবিচারের বালাই ছিলো না। যদিও ওর গাড়িতে উঠে বেড়াতে যাবার সময় বলতাম, শোন আজ ওসব চলবে না, কি বলো? সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নেড়ে জানাতো ওহ্ যা বলেছো, ঘেন্না ধরে গেছে আমার। চলো, আজ এমনিই বেড়িয়ে আসবো খানিকটা!—শিপশেড বে-তে গেলে কেমন হয়! তারপর এক মাইল পথ পেরুতে না পেরুতেই গাড়ি থামিয়ে বলতো ওই দ্যাখো অর্থাৎ রাস্তায় ঘুরতে থাকা মেয়েটাকে দেখিয়ে সে বলতো, পা দু'টো দেখেছো? ওকে আমাদের সঙ্গে আসতে বলি না কেন? শিপশেড বে-তে গিয়ে একটা সাভাৎ বাগাতেও তো পারে! এবং আমি কোন অভিমত জানাবার আগেই সে নিজস্ব ঢঙে হাত ইশারায় ডাকতে শুরু করতো মেয়েটিকে। আর আশ্চর্য, দশটার মধ্যে ন-টা মেয়েই সাড়া দিতো ওর আহবানে। এবং খানিকটা পথ যাবার পরেই সে এক হাতে স্টিয়ারিং হুইল আর অন্য হাত মেয়েটির বুকের কাছে রেখে জানতে চাইতো, যদি

সে কোনো জোটাতে না পারে, আমাদের সঙ্গ দিতে তার আপত্তি আছে কিনা। মেয়েটি সাড়া দিতে দেরী করলে কিংবা হাতের ছোঁয়াকে আপত্তিকর মনে করলে সে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে মেয়েটিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে এবং বলবে, আরে এরকম মাল বহুত দেখা আছে আমাদের, কি বলো হেনরী? তারপর গাড়ি চালাতে চালাতে আমাকে সান্তনা দেবে—ভাবনার কি আছে, আর একটা মাল শিগগীরই জুটে যাবে। তারপর আবছা আঁধারে কোনো একটা মেয়েকে দেখেই আবার চেঁচিয়ে উঠতো—হ্যালো সিস্টার! কী করছো? বেড়াচ্ছো বুঝি? এবং হয়তো বা রোমাঞ্চকর কোনো ঘটনা ঘটেও যেতো পরক্ষণে। খানকি মেয়েটা তার স্কার্ট খুলে তা দিয়ে দিতো তোমার হাতে। কখনো বা বিনে পয়সায়—এমনকি একটি চুমুক মদ না খাইয়ে- রাস্তার ধারে কিংবা গাড়ির ভেতর এক জনের পর একজন সওয়ার হয়ে যাও। আর মেয়েটি যদি বুদ্ধু টাইপের হয়, তাহলে কেল্লা ফতে হবার পর তাকে তার বাড়িতে লিফ্‌ট না দিলেও চলে। সে দিব্যি বলে দিতো—আমরা তো ওদিকে যাচ্ছিনা! এরকম বেজন্মা ছিলো ম্যাক।

মেয়েটিকে গাড়ির দরজা খুলে নামিয়ে দিয়েই আমরা ভোঁ—কাট্‌! ম্যাকের দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা, মেয়েটা পয়-পরিস্কার ছিলো তো? সারাটা রাস্তা ওর মাথায় কেবল এই চিন্তাটাই ঘুরপাক খেতো।

ঃ যীশু আমাদের আরো হুশিয়ার হওয়া উচিত!—সে বললো।

—তুমি জানো না, ও তোমার ভেতরে কি ঢুকিয়ে দিয়ে গেলো! শোনো, এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, মানে লোকে একটি যোনিতে

তৃপ্ত থাকে না কেন। ধরো ট্রিক্সের কথাই। চমৎকার মেয়ে তাইনা? এবং আমি তাকেও পছন্দ করি। কিন্তু একটা কারণে তবে ধেৎ, এসব প্যাচাল পেড়ে লাভটা কি? আচ্ছা শোনো, নিজের আবোল তাবোলের এক পর্যায়ে সে বললো, ধরো, ট্রিক্সকে বললাম, এই মেয়ে ওটা বের করো এবং দু'পা ফাক করো! কোনো কথা নয়! এরকমটা শুনে ওর মুখের অবস্থা কীরকম হয়, তুমি কল্পনা করতে পারো? আমি একদিন কুকর্মের ঠিক আগের মুহূর্তেও যখন কোট প্যাণ্ট পরে আছি ও অবাক হলো। কোট গায়ে থাকার জন্যে ও অবশ্য কিছু মনে করলো না, কিন্তু টুপি? আমি অনুমান করেছিলাম, ওই টুপির কারণেই সে শুকনো থাকবে এবং ঝটিতি কাজ সেরে আমি উঠে পড়বো। কিন্তু তার ভেতরটা সিক্ত হয়েছে এবং আমরা সারারাত তাণ্ডবলীলা চালিয়েছি। শোনো, এটা কিছু না। কিসসু না। একবার পেয়ে গেলাম মাতাল আইরিশ কুত্তিকে। ওর ছিলো বিদঘুটে স্বভাব। কিছুতেই বিছানায় শোবে না। তাকে লাগাতে হবে টেবিলে শুইয়ে। তা, এক আধবার টেবিলে এসব চলতে পারে। তাই বলে বারবার? ধূত! একদিন রাত্রে আমার খুব টাইট অবস্থা। আমি ওকে বললাম, মদ খাবি মাগি? যতো পারিস খা! কিন্তু আজ তোকে আমার সঙ্গে বিছানায় গিয়ে শুতেই হবে। আমি বিছানায় ফেলেই লাগাবো তোকে। ওহ, কতোদিন এই টেবিলের খেল চালাচ্ছিস তুই! বললে বিশ্বাস করবে না বিছানার প্রস্তাবে রাজি করাতে ঝাড়া এক ঘণ্টা সময় লেগেছিলো আমার সেদিন। কিন্তু কি শর্তে সে রাজি হয়েছিলো শুনবে? শর্তটা হলো

লাগাবার সময় আমাকে টুপি মাথায় দিয়ে থাকতে হবে। ভাবো একবার। যেখানে পায়ের জুতো থেকে শুরু করে গলার টাইটা পর্যন্ত থাকবে না সেই উদোম শরীরে মাথায় রাখতে হবে টুপি! আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, তা এসময় আমাকে হ্যাট মাথায় দিতে বলছো কেন? বলো তো, একথার জবাবে সে কি বললো? বললো এতে অনেক ভদ্র মনে হয়। শুনলে মাগির কথা!

ম্যাকগ্রেগর আমার পুরানা ইয়ার। এমন বজ্জাত আর দুটি দেখিনি আমি। ব্যাটা শুয়োর মুখো স্কচ ওর বাপটা ছিলো আরেক হারামি। যখন বাপে বেটায় লাগতো, সে এক দেখবার মতো ব্যাপার হতো বটে। রাগের চোটে বুড়ো নাচতে শুরু করতো। বুড়ীটা ছিলো এক কথায় খতরনাক। সে এমন চাউনি হাঁকাতো যে ছোড়ার অবস্থা কেরাসিন্। ম্যাক তখন কি করতো? না, অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে বেড়িয়ে পড়তো। সংসার ত্যাগ যাকে বলে! কেননা যাবার সময় নিজের সব জিনিষ, মায় পিয়ানোটা পর্যন্ত সে সঙ্গে নিয়ে যেতো।

কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই আবার খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন! এবং বাড়িতে থিতু হবার দু'তিনদিনের মাথায়—কোনো রাত্রে হয়তো দেখা যেতো এক বিচিত্র দৃশ্য। মাল টেনে ভোম হয়ে বাড়িতে ফিরেছে ম্যাক। সঙ্গে একটা পথে-কুড়োনো ভাঁওতা-মেয়েলোক। কী ব্যাপার? না, মেয়েটা তার কাছে আজ সারা রাত থাকবে। এটা অবশ্য নতুন নয় বাড়ির লোকদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো। তবে একটা ব্যাপার ছিলো প্রকৃতই আপত্তিকর। ছোড়া হাঁক

পেড়ে তার মাকে বলতো—ভোর-ভোর যেন দু'জনের নাস্তা দেয়া হয় বিছানাতেই। বুড়ী মুখিয়ে উঠলেই সে তর্জনি তুলিয়ে বলতো, খবরদার, একটা কথাও নয়। মনে রাখিস, তোর কিন্তু এখনো বিয়ে হয়নি। বেশি তেড়ি বেড়ি করবি তো, সে রাগের চোটে কথাই শেষ করতে পারতো না। আর বুড়ী? সে হাত নাচাতে নাচাতে বলতো এই না হলে আবার ছেলে! সোনার ছেলে! পুত্র রত্ন! হায় যীশু কেন এমন কুসন্তান পেটে ধরিছিলাম!

ঃ চোপ। শুকনো বরই কোথাকার! গর্জে উঠতো সুপুত্র। এবং যতোক্ষণ না রণক্ষেত্রে তার বোনটি আসবে, ততোক্ষণ বাক যুদ্ধ চলবেই। বোন বলতো, দ্যাখো ম্যাক এখানে আমার নাক গলাবার দরকার নেই। কিন্তু নিজের মাকে তুমি নিশ্চয়ই এভাবে আপমান করতে পারানা!

তখন ম্যাক তার বোনকে অনুনয় করতো নাশতা আনবার জন্যে। আর তখনই তাকে জিজ্ঞেস করতে হতো ল্যাজে বাঁধিয়ে আনা ছুঁড়িটার নাম যাতে বোনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। বলতো, মেয়েটা একেবারে বাজে নয়। ওদের বাড়ির মধ্যে ও-ই ই সবচে ভালো মেয়ে। লক্ষ্মী বোনটি, এখন খানিকটা চমৎকার বেকন আর ডিম হলে যা চমৎকার হতো না ইস্। নিয়ে আসবে? আচ্ছা, বুড়োটা কি ধারে কাছে আছে? ওর মেজাজ কিরকম? কিছু টাকার দরকার ছিলো। ভাও করতে পারবে? সামনের ক্রিষ্টমাসে যা দুর্দান্ত একটা জিনিষ তোমাকে দেবো না, মাথা ঘুরে যাবে! এবং সবকিছু মিটে গেলে সে কম্বল সরিয়ে

প্যাটসি নামের মেয়েটির উদলা গতর বোনকে দেখিয়ে বলতো, মেয়েটা সুন্দর, তাই না? ওর পাছুটো দ্যাখো। লক্ষ্মী বোনটি আমার, দু'কাপ কফিও দিও কিন্তু। আর হ্যাঁ, বেকনটা যেন টাটকা হয়, কেমন? আরো কিছু যদি থাকে আর হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি! ম্যাক গ্রেগরের যে জিনিষটা আমার পছন্দ হতো, তা হচ্ছে তার দুর্বলতা। ওই দুর্বলতার জন্যেই সে ছিলো স্রেফ ঝাড়া হাত পা। কাজকর্মের বালাই তার ছিলোনা। সে ছিলো, যাকে বলে অকারণে ব্যস্ত। মনে হতো, কী যেন তার শেখার আছে। বোঝার আছে। যেমন গাড়িতে অফিসে যাতায়াতের পথে ডিকশনারির অন্তত একটি করে পাতা রোজ নিবিষ্ট ভাবে পড়তো সে। ঘটনার ডিপো বলা যায় তাকে। এবং ঘটনাটি যতো অদ্ভুত হবে, আনন্দও পাবে সে ততো বেশি। সে বলতো, জীবনটা আর কিছুই না স্রেফ একটা প্রহসনের সমষ্টি। একটা খেলা। একটা জিনিষ এসে অন্যটাকে বাতিল করে দেয় এই খেলায়। এবং এই ভাবেই চলতে থাকে জীবন নামের রেলগাড়িটা। ওর ছেলেবেলাটা কেটেছে নর্থ সাইডে। আমাদের আগেকার পাড়াটার খুব কাছাকাছি। বস্তুত সে বেড়ে উঠেছিলো নর্থ-সাইডের আলো বাতাসেই। আমি তাকে যেসব কারণে পছন্দ করতাম, এটি ছিলো তার একটি।

মুখের কোনা দিয়ে কথা বলা, বিরক্ত হলে অদ্ভুত ঢঙে থুথু ফেলা, কথার মধ্যে বিটকেলে সব শব্দ, আবেগ প্রবনতা, সীমিত দিগন্ত, তুচ্ছ জিনিষের জন্যে কৌতুহল, শেখার আগ্রহ, নাচের স্পৃহা, দুনিয়া সম্পর্কে বলাবলি করা অথচ শহরের বাইরে পা না-দেয়া—ওর এইসব

ব্যাপার গুলো অদ্ভুত লাগে আমার কাছে। জার্মানদের ঘেন্না করে সে—কিন্তু নীট্‌শে তার খুব প্রিয়। সে বলতো—নীটশে তো আসলে জার্মান নয় পোল টোল হবে আমি পড়েছি। আমাকে লক্ষ্য করে বলতো, নিজেকে তুমি যতোই স্বাধীন, যতোই আলাদা বলে মনে করো না কেন তুমি আসলে তা নও। সংসারে আর দশ জনের সঙ্গেই তোমার চলতে ফিরতে হবে। তোমার ধারণা, তুমি তোমার চার পাশের লোক জনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভুল রজনী ভুল। মস্ত বড়ো ভুল করে বসে আছো তুমি।···আজ থেকে পাঁচ বছর কিংবা ছমাস পর তুমি কোথায় থাকবে বলতে পারো ?

তুমি অন্ধ হয়ে যেতে পারো। আগামীতে কি হবে তা কেউ বলতে পারেনা। এ ব্যাপারে তুমি শিশুর মতোই অসহায়।

: তাই কি ? আমি জিজ্ঞেস করি।

: তা নয় তো কি ?—তার তরিৎ জবাব। সে একটু থেমে বললো, প্রয়োজনে ধরা দেবে, এরকম কিছু বন্ধু কি তুমি চাওনা ?

তোমার এমন অবস্থা হতে পারে যে খুবই বেকাদায় পড়ে গেলে তুমি। তখন সেই-ই তো তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। একজন মানুষ ভবিষ্যতে কি করবে, তা কি তুমি এখুনি বলে দিতে পারো। আসলে কোনো মানুষই একা থাকতে পারেনা।

চৌদ্দ

আসলে আমার স্বাধীনতার ব্যাপারে ও ছিলো বেশ দুর্বল। আমি ওর কাছে কখনো কিছু ধার চাইলে ভীষণ খুশি হতো

সে। মুখটা মুহূর্তে উজ্জল হয়ে উঠতো ওর। তবে ঝামেলা ছিলো এই যে, আমার ধার চাওয়া ওর সামনে বন্ধুত্ব সম্পর্কে এক প্রস্থ বক্তৃতার সুযোগ এনে দিতো।

ঃ তাহলেই দ্যাখো! সে বলতে শুরু করতো—টাকার প্রয়োজন মানুষের থাকবেই। কবিকেও খেতে হয়, তাইনা? বেশ বেশ। ···ভাগ্যিস তুমি আমার কাছে এসেছো। কেননা তোমার কাছে আমি দিলখোলা দিলদরিয়া। আর তুমিও নও আমার কাছে অজানা অচেনা। ব্যাটা হৃদয়হীন কুকুর শাবক, বল্ তোর কতো দরকার! জানো আমার খুব বেশি টাকা নেই। তবে যা আছে তা দু'জনে ভাগ করে নেয়া যাবে আধাআধি—কি বলো?

চমৎকার হবে না তাহলে? নাকি সবই দিয়ে দিতে বলো তোমাকে? যাতে ফকিন্নির বাচ্চার মতো আমাকে গিয়ে রাস্তায় নামতে হয় এর পরে। তুই কি তাই চাস শুয়োর? খিদে পেয়েছে বুঝি? আচ্ছা বেশ। হ্যাম আর ডিম খুব ভালো লাগবে তাই না! রেস্তোরা অব্দি গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে বুঝি? চেয়ার থেকে উঠো। তোমার হোগার নিচে একটা কুশন রাখি, কেমন? ব্যাটা শয়তান! ইমানে, আমি তোমার পকেটে কোনোদিন টাকা দেখিনি। তোমার লজ্জা করে না? তুমি ওই ছোকরাগুলোর কথা বলবে। যারা মাঝে মধ্যে আমার চারপাশে এসে ভীড় জমায়। শোনো মিয়া, তুমি যে ভাবে আমার কাছে চাইলেই পাও ওদের সে আশা নেই। ওভাবে আমি ব্যাটাদের পাই পয়সাটি পর্যন্ত দেবো না, বুঝলে। কিন্তু হে গর্দভচন্দ্র, তোমার ওই সব বড়ো বড়ো

বুলির গুষ্টি মারি আমি। তুমি কি করবে না! না, দুনিয়াটাকে বদলে দেবে। কি করবে না, টাকার জন্য কাজ করবে না! তাহলে তুমি কি চাও? না, কেউ একজন একটা রুপোর থালার ওপর টাকা সাজিয়ে এনে তোমার চরণে উৎসর্গ করবে। হেনরী, তুমি স্বপ্ন দেখছো। তুমি একথা জানোনা, যে, সবাই খেতে চায়? বেশির ভাগ লোকই তো পেটের জন্যে কাজ করে। তারা তোমার মতো সারাদিন শুয়ে থাকে না। আর হঠাৎ প্যান্টিটা পরে নিয়েই টাকার জন্যে জানি-দোস্তের বাড়ির দিকে দৌড় দেয় না।

যদি এখানে আমি না থাকতাম? তুমি কি করতে? কি, চুপ করে রইলে কেন? আমি অবশ্য জানি, তুমি কি বলবে। কিন্তু দ্যাখো বৎস, এভাবে কিছুদিন চলে, সারাজীবন কাটানো যায় না। কথাবার্তা তোমার চটকদার। তোমার সঙ্গে বাতচিত করে সত্যিই আনন্দ পাই আমি। কিন্তু আমি যখন তোমাক খুঁজি তুমি লাপাত্তা। বাড়িতে ডেকে পাওয়া যায় না, টেলিফোনে নিরুত্তর। চিঠি লিখলেও তার কোন জবাব নেই। বলি, ব্যাপারটা কি? ও, প্রয়োজন ফুরোলে বন্ধুবান্ধবের কথা আর তোমার মনে থাকে না! এরকম ব্যবহার কি যুক্তি সঙ্গত। বলো—না! এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি টাকা দেবো তোমাকে। সে যাই হোক, তুমি আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। যদিও তুমি কুঁড়ের বাদশাহ আর কিছু নও। তুমি বরং না খেয়ে থাকবে; তবু দরকারী কোনো কাজে হাত দেবে না।

আমি 'না' বলবার পুরস্কার সেই প্রস্তাবিত টাকাটির জন্যে হাত

বাড়াতেই সে নতুন করে জ্বলে উঠলো যেন তেলে বেগুনে। বললো, টাকার জন্য দেখছি লোকটা সবকিছুই বলতে পারে। হ্যাঁ নীতিবোধের কথা বললে, তোমাকে একটা র‍্যাটেল সাপ ছাড়া আর কি ভাবতে পারি,, বলোতো চাঁদু। না, আমি তোমাকে আগেই টাকা দেবো না। তার আগে তোমার ওপর খানিকটা অত্যাচার চালাতে চাই। টাকা অবশ্য তোমাকে দেবো; কিন্তু তোমাকে রোজগার করে নিতে হবে।

শোনো—আমার জুতো জোড়া পালিশ করে দাও—বুঝলে! আমি সঙ্গে সঙ্গে জুতো জোড়া হাতে তুলে নিয়ে ব্রাশ চাইলাম ওর কাছে। ম্যাকের জুতোয় আমি ব্রাশ চালাবো, তাতে মুশকিলটা কোথায়। কিন্তু দেখলাম, ম্যাক ভ্যাবাচেকা খেয়ে. হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার হাতে ধরা ওর জুতো জোড়ার দিকে।

তাহলে জুতো জোড়া সত্যিই পলিশ করবে তুমি! —চোখ কপালে তুলে ম্যাক বললো—হায় যীশু, নিচে নামবার আর বাকি থাকলো কি! ছি ছি ছি! কোথায় গেলো তোমার অহঙ্কার। সেই তুমি, সেই সবজান্তা। দুনিয়ার সব কিছু যার নখ দর্পনে। তাজ্জব ব্যাপার যাই হোক। যে লোকটা এত জানে, সে তার একবেলার অন্নের জন্যে বন্ধুর জুতো পালিশ করছে। এই যে বেজম্মা এই নে ব্রাশ। ভাল করে পালিশ কর্। জুতো যেন চকচকে হয়।

কিছুক্ষণ পর! বেসিনে হাত ধুচ্ছিলো ম্যাকগ্রেগর। মুখে গুন গুন শব্দ। হটাৎ উৎফুল্ল গলায় সে বললো, আজকের দিনটা

কেমন, হেনরী! বাইরে কি রোদ্দুর আছে! তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো, বুঝলে। দুর্দান্ত রেস্তোরাঁটা, চমৎকার রান্না ওদের। দেখো, আবার ওজর দেখিও না—কোথাও কোনো জরুরী কাজের। তুমি তো জানোই' 'এক জায়গায় নিয়ে যাবো' কথাটার মানে কি। আমি যেখানেই যাই, আমার যন্ত্রপাতি গুলোও সেখানেই যায় সঙ্গে সঙ্গে?'

একটু পরেই আমরা দু'জন এক রেস্তোরায়। এক টেবিলে মুখোমুখি বসা। রেস্তোরটা পানির ওপর। তাই কাঠের মেঝের নিচ দিয়ে কল কল শব্দে বয়ে যাচ্ছিলো স্রোত। সুস্বাদু সামদ্রিক খাদ্য এক্ষুণি আসবে আমাদের টেবিলে। ম্যাকগ্রেগর বললো—তুমি যা করতে চাও, তা করতে পারলে জীবনটা নেহাৎ মন্দ নয় হেনরী। আমার কি ইচ্ছে আছে, জানো? কিছু পয়সা হাতে জমলেই আমি বেরিয়ে পড়বো বিশ্বভ্রমণে। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। যদিও ব্যাপারটা তোমার জন্যে কষ্টকর। প্রায় দুঃসাধ্যই; কিন্তু তাতে কি? আমি কিছু টাকা যথাযথভাবে ব্যয় করতে চাই তোমার পেছনে। আমি দেখতে চাই, তোমার হাতে কিছুটা দড়ি ধরিয়ে দিলে তুমি কি করো! হ্যাঁ, আমি তোমার হাতে কিছু টাকা দেবো। না, ধার টার নয়। আমরা দেখবো, পকেটে টাকা উঠিলে তোমার সেই নীতিবোধ, সেই মহৎ আদর্শগুলোর অবস্থা কি দাঁড়ায়? সেদিন তোমাকে প্লেটো সম্পর্কে কিছু বলেছিলাম, মনে পড়ে? আমি আসলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম তোমাকে। তুমি প্লেটোর অ্যাটলান্টিস সম্পর্কিত

গল্পটি জানো কিনা। তুমি জানো? বাহ! আচ্ছা, ব্যাপারটা কি নিছক গাল গল্প? নাকি ওরকম একটা দেশ আদতেই ছিলো? তোমার কি মনে হয় হেনরী!

আমি আর ওকে বললাম না যে, ওরকম শত সহস্র মহাদেশের স্থায়িত্ব, অতীতে বা ভবিষ্যত সম্পর্কে আমরা, এমনকি স্বপ্ন দেখতেও শুরু করিনি। কেবল বললাম, 'এটা সম্ভব। অবশ্যই অ্যাটলান্টিসের মতো কোন জায়গার অস্তিত্ব ছিলো!'

: যাই হোক! ম্যাক বললো আমি ভেবেছি, একদা এরকম একটা সময় নিশ্চয়ই ছিলো, যখন মানুষ ছিলো অন্যরকম। আমি বিশ্বাস করিনা যে তারা এখনকার মতো এবং গত কয়েক বছরের মতো এরকম শুয়োর ছিলো। আমার মনে হয়, সম্ভবত: এরকম একটা সময় ছিলো, যখন মানুষ জানতো, কি ভাবে জীবন যাপন করতে হয়। বুঝতো, জীবনকে কি করে সহজ ভাবে নেয়া যায়। তাকে উপভোগ করা যায়। আমি হঠাৎ এতো ক্ষেপলাম কেন জানো? আমার বুড়ো বাপটার অবস্থা দেখে। অবসর জীবনের শুরু থেকেই লোকটা ফায়ার প্লেসের সামনে স্থায়ী আশ্রয় নিয়েছে। নিস্তেজ, উদাসীন বসেই আছে, বসেই আছে। যেন একটা গরিলা। লোকটা সারা জীবন দাসত্ব করেছে। আমার জীবনে ওরকম কিছু ঘটবার উপক্রম হলেই আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মারা যেতাম।

তোমার চারদিকে তাকাও! আশে পাশের চেনা লোকগুলোকে দ্যাখো। তারা সবাই বলছে, আমাদের বাঁচতে হবে। কেন?

সেইটেই আমার জানা দরকার। যখন যুদ্ধ লাগলো, আমি ওদের ট্রেঞ্চের দিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, ভালো। ওরা হয়তো সামান্য হলেও এবার একটা চেতনা নিয়ে ফিরে আসবে। ওদের অনেকেই ফিরে এলোনা। কিন্তু যারা ফিরে এসেছে? তারা কি আগের চেয়ে বেশি মানবিক, বেশি গ্রহণ যোগ্য হয়েছে? একেবারে না। মনের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকেই এক একজন কসাই। ওরা আমাকে অসুস্থ করে তোলে। ওদের সব শালাই! কিন্তু হেনরী হে, চিরদিন এমনটা ছিলো না। এক সময় সব কিছু ছিলো অন্য রকম। আমরা কোন সত্যিকার জীবন দেখিনি—দেখবোও না আর কোনদিন। আমার জানা যদি সঠিক হয়—এরকমটাই চলবে আরো কয়েক হাজার বছর। তুমি ভাবছো আমি বেতন ভোগী। তোমার ধারণা, আমি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চাই। তাই না? মানলাম। আমি ঠিকই মালিক হতে চাই একটা ছোটখাটো টাকার স্তুপের। যাতে আমি এই আবর্জনার ভেতর থেকে পা বের করে নিতে পারি। আমি অনেক দূরে কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধতে পারি এক নিগ্রো পল্লী-রমনীর সঙ্গে। হায়, নিজের অবস্থান খুঁজে বের করতে গিয়ে আমার অণ্ডকোষ বেরিয়ে গেছে!

আরো এক প্রস্থ সামুদ্রিক খাদ্য গলঃধকরণের পর ম্যাক আবার শুরু করলো— তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যে বেড়িয়ে পড়বো—এটা সত্যি সত্যি চিন্তা করেছি আমি। তুমি হয়তো বলবে, 'বউ বাচ্চার কি হবে? তাদের দেখবে কে?' আমি জানতে চাই ওকে কবর দিচ্ছো

করে? কথা বলতে বলতে সে হাসতে থাকলো। হাসি থামলে সে বললো, ভাবছো, ওকে তোমার কাছে ভিড়িয়ে দেবার বেলায়, আমিও ছিলাম একজন। তা ওকে আমি জুটিয়ে দিয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু কে ভেবেছিলো, ওকে হুম্ করে অমন বউ বানিয়ে ফেলবে? ছিঃ ছিঃ ওই কুত্তিকে কেউ বিয়ে করে? তোমার জীবনটা বরবাদ করে দিলো মাগিটা। শোনো হেনরী। যা হবার হয়ে গেছে। এখনো সময় আছে। ওর খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসো—যদি ভালো চাও। আমি অবশ্য থোড়াই পরোয়া করি—তুমি কি করবে বা কি করবে না। কোথায় যাবে বা যাবে না। যদি তোমাকে আফ্রিকাতেও চলে যেতে হয়—তবু ওকে ছাড়ো। ওর সঙ্গ এখন তোমার জন্যে শুভ নয়। দুনিয়ায় কতো যোনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তোমার জন্যে, কতো শাসালো সব যোনি। অথচ তুমি একটা শুয়োরনী নিয়ে শুয়ে আছো। তুমি কি আর একটু বেকন নেবে? যা খেতে ইচ্ছে, খেয়ে নাও। আর একটা ড্রিংক? অ্যাঁ, দ্যাখো, তুমি আজ যদি আমার কাছ থেকে পালাতে চাও, আমি সাফ সাফ বলে দিচ্ছি, একটি পয়সাও পাবেনা। কী বলছিলাম যেন? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বলছিলাম ওই পচা বাসি মাতারিটার কথা। যে তোমার পায়ে পেরেক মেরে আটকে রেখেছে। তুমি ওকে ছাড়বে কিনা, বলো। অবশ্য প্রায়ই তুমি বলো, কাট্ মারবে। কিন্তু কোথায় কি? তুমি যেমন ছিলে, তেমনি থাকো। ভাবো ওর প্রতি পক্ষ পাতিত্ব করছো তুমি। আসল ব্যাপারটা কি জানো? তোমাকে তার আর প্রয়োজন নেই। তুমি সেটা বুঝতেও পারোনা

উল্লুক ? আর ওই বাচ্চাটা ! হায়রে বাচ্চা ! বাচ্চা রে বাচ্চা ! আরে, আমি হলে কবে ওটাকে পানিতে ডুবিয়ে দিতাম। কথাটা খারাপ শোনায়, তাই না ? কিন্তু, তুমি জানো, আমি কি বোঝাতে চাইছি ? তুমি ওর বাবা নও ! তবে তুমি কি ? তুমি হচ্ছো গিয়ে একটি পয়লা নম্বরের সং-গাধা, ওই যে বিচ্ছিরি বোঝা টেনে টেনে জিন্দেগী বরবাদ করে দিচ্ছে। আরে মিয়া, নিজের চিন্তা করে নাও, এই বেলা। নিজের বুঝ বোঝো। ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হয় যে তোমার স্বাস্থ্যটি এখনো ভালো। চেহারাটাও মন্দ নয়। এই নরক থেকে বেরিয়ে দুরে কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করো না কেন ? এ ব্যাপারে যদি তোমার কিছু টাকার দরকার হয়, তার যোগার আমি করবো। কেন করবো ? করবো এজন্যে যে আমি তোমাকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করি—ভালোবাসি। আমি তোমার কাছ থেকে এতো নিয়েছি হেনরী ? —যা দুনিয়ায় আর কারো কাছ থেকে নেবার কথা কল্পনাও করা যায়না। আমাদের দুজনের মধ্যে কতো মিল রয়েছে তুমি তা লক্ষ্য করেছো ? এই মিলগুলো আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের পুরনো পাড়া থেকে। আফশোস—তোমার সঙ্গে সেখানে আমার পরিচয় হয়নি। এই যে, আমি আবেগ প্রবন হয়ে উঠছি।

দিনটা এগিয়ে চললো ওই ভাবেই। প্রচুর আহার্য ও পানীও ধংস করলাম আমরা দুজন। সময় গড়াতে লাগলো। গাড়িতে চড়ে আমরা হেথায় হোথায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম বেঘোরে। কখনো সমুদ্র তীরে বসে রকমারি যোনির আনাগোনা দেখতাম। গান

গাইলাম, হাসলাম, বকবক করলাম। এ ছিলো সেইসব দিনের একটি, যেসব দিন আমরা কাটিয়েছি আরো অনেক। সময় যেন থমকে যেতো। আনন্দ ছাড়া চারদিকে যেন আর কিছু নেই। আঠালো স্বপ্নের মতো দিনটা গড়িয়ে চলতো শ্লথ গতিতে। কিন্তু পরদিন এর প্রতিক্রিয়া অন্তত আমার জন্যে হতো শ্বাসরুদ্ধকর। নানা দৈন্য ও দুশ্চিন্তা আমাকে করে তুলতো বিষন্ন ও ক্লান্ত। অবশ্য এভাবে যে আর চলবে না, তা আমি আগে থেকেই চিন্তা ভাবনা করেছি। ভাবতাম আর কতো দিন! একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু সেই সময় আর সুযোগটাই আমার কাছে এগিয়ে আসছিলো না তখনো পর্যন্ত।

কিছু একটা হওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো। বড়ো কিছু। কিন্তু সে জন্যে একটা ধাক্কা দরকার। না, আমার ভেতরকার শক্তির ধাক্কা নয়—বাইরের কোনো সঠিক পরিচালনা। লাগ সই যোগসূত্র। সারাটা জীবনই আমার যাবতীয় কর্মের সাফল্য এসেছে সমাপ্তিতে। আমি জানতাম, রূপোর চামচ মুখে নিয়ে আমার জন্ম। সেই সঙ্গে ডাবল ক্রাউন!

সংসারের বাইরের পরিস্থিতি ছিলো আমার খারাপ—আমি মানি। কিন্তু ভেতরকার অবস্থা নিয়েই ছিলো আমার মাথা ব্যাথা। নিজেকে নিয়ে সত্যিই আমি ভীত ছিলাম। আমার আশা আমার কৌতুহল, আমার ভাবান্তরের শক্তি নিয়ে আমি ছিলাম চিন্তিত। কোনো পরিস্থিতি সরাসরি আমাকে ভয় দেখাতে পারেনি। কেননা নিজেকে দেখতাম, মাখনের বাটিতে বসে মধু চুষতে। এমনকি আমি যদি

জেলেও যেতাম, সেখানেও আমার প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব ঘটবার কোনো সম্ভাবনা ছিলোনা। আমার ভেতরটা এতো চমৎকার ছিলো যে দুনিয়ার তাবৎ সমস্যা নিজের কাধে তুলে নিয়েছিলাম। আর এজন্যেই তো আমি বিপন্ন হয়েছি বারবার।

সত্যি বলতে কি, আমি আমার পরিণাম সম্পর্কে সময় সচেতন ছিলাম না। যেমন একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখতাম, ঘরে খাবার নেই। এমন কি বাচ্চাটার জন্যেও। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেড়িয়ে পড়তাম খাবার যোগাড় করবার জন্যে। আমি কেবল নিজেদের খাবারের চিন্তাই করতাম না! আমি দণ্ডায়মান ছিলাম এক সর্বজনীন ক্ষুধার প্রেক্ষাপটে। যে মুহূর্তে নিজেদের আহার্যের কথা চিন্তা করতাম, ঠিক তখনই আমার মনে হতো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আহার্য পরম্পরার কথা। খাদ্য-সামগ্রী কোথায় কীভাবে তৈরী হয়? এবং কাদের হাতে? তারা আবার তা খেতে পায়না কেন? আর কীভাবেই বা এরকম একটা পাকা বন্দোবস্ত করে ফেলা যায় যাতে সবাই তা প্রয়োজনে পেতে পারে এবং এই সহজ সমস্যাটি সমাধান করতে গিয়ে সময়ের অযথা অপচয় না-ঘটে।

আমি আমার বউ বাচ্চার জন্যে চিন্তিত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখ অনুভব করতাম হটেনটো আর অস্ট্রেলীয় বুশম্যানদের জন্যেও। অভাবী বেলজীয়, তুর্কী আর আর্মেনীয়দের জন্যে। গোটা মানব জাতির জন্যে আমি দুঃখিত ছিলাম—মানুষের নির্বুদ্ধিতা আর কল্পনা শক্তির অভাবের কারণে। একবেলা অনাহার

আমার কাছে ততোটা ভয়াবহ ছিলোনা, যতোটা বিরক্ত করতো রাস্তার ভৌতিক শূন্যতা। কী জঘন্য এক একটা বাড়ি। একটি অন্যটির মতোই। আর যা নিরর্থক, যা নিরানন্দ সেগুলো! উহ্—ভাবা যায় না। পায়ের নিচে পেভমেন্টের পাথর, রাস্তার মাঝখানে অ্যাশফল্ট। চমৎকার বাদামী পাথরগুলোর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে কতোই না আরাম। যে কোনো লোক সারারাত এবং সারাটা দিন এই দামী পাথরগুলো মাড়িয়ে এক টুকরো রুটির জন্যে ঘুরতে পারে!

যদি কেউ একজন একটা ডিনার-বেল বাজাতে বাজাতে চেঁচাতে থাকে—ভাইসব, আমি ক্ষুধার্ত! কেউ কি জুতো পালিশ করাবেন? কারুর বাড়ির ময়লা ফেলতে হবে? কিংবা ড্রেন-পাইপ সাফ করাবেন গো—? কিন্তু না, তুমি ফাঁদ পাততে চাও না। তোমার বাধে। রাস্তায় যদি কাউকে বলো তুমি ক্ষুধার্ত—তাহলে তুমি কিছুই পাবে না। উপরন্তু লোকটা দৌড়ে পালাবে। এই ব্যাপারটা আমি কখনো বুঝতে পারিনি। এখনো বুঝিনা। অথচ পুরো জিনিসটা কতো সহজ। কেউ আমার কাছে এলে তুমি কেবল বলবে—হ্যাঁ। এই ছোট্ট শব্দটি। আর যদি হ্যাঁ বলতে না পারো, তাহলে তার হাত ধরবে এবং তার জন্যে অন্য কারো কাছে হাত পাতবে। স্রেফ এক টুকরো রুটির জন্যে ইউনিফর্ম পরেই অজানা অচেনা মানুষদের কেন মেরে ফেলা হয়, এটা আমার কাছে এক রহস্য। আমি চিন্তা করি এসব নিয়েই। কারা ফাঁদ পাততে যাচ্ছে, তাতে খরচা পড়লো কতো, সেসব গু-মুত্ দিয়ে আমার দরকার কি

বাবা। আমি এই ভবে এসেছি জীবন ধারণ করতে, হিসেব করতে নয়। অথচ ওই জারজরা তোমাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। তারা চাইবে তুমি তোমার সারাটা জীবন কেবল আঁকজোক কষেই কাবাড় করে দাও। অবশ্য তাদের এই ধ্যানধারণার পেছনে যুক্তি আছে। কারণ আছে। বুদ্ধিবৃত্তির উপস্থিতি। আমার হাতে হাল থাকলে নৌকাটা হয়তো এমন শৃংখলার সঙ্গে এগোতে পারতো না। কিন্তু যীশুর দোহাই, জীবনটা হতো আরো সুন্দর। তুচ্ছ জিনিষের জন্যে হেগেমুতে প্যান্ট নষ্ট করতে হতো না তোমাকে। আমি কর্ণধার হলে, ঝকঝকে রাস্তায় চকচকে গাড়ির ভীড় হয়তো জমে উঠতো না। হয়তো লাউড-স্পীকার আর কোটি কোটি টাকা দামের নানা জিনিসে ভরে উঠতো না চারধার। জানালা থাকলেও, তাতে কাঁচই থাকতো না হয়তো। কে জানে, তোমাকে সম্ভবত : খোলা মাঠের মধ্যেই ঘুমোতে হতো! ব্যবস্থা থাকতো না ফরাসী, ইতালীয় কিংবা চৈনিক-রেস্তোরার। আবেগাক্রান্ত মানুষ একজন অন্য একজনকে হত্যা করতো ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে—কিন্তু জেলে যেতো না। জজ কিংবা পুলিশের থাকতো না কোনো বালাই। এবং অবশ্যই থাকতো না মন্ত্রীসভা এবং আইন পরিষদ। কেননা মান্য বা অমান্য করার মতো কোনো আইন থাকলে তো। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়তো মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছরই চলে যেতো। কিন্তু পাসপোর্ট কিংবা ভিসা বলে কোনো বস্তু থাকতো না। দরকার হতো না কার্তে দু'আইদেন্

তিতে বা আইডেন্‌টিটি কার্ড—যার মাধ্যমে মানুষকে নম্বর এবং সিলমোহর মেরে রেজিস্টার্ড বানিয়ে ফেলা হয়। তখন ইচ্ছে করলেই ফি-হপ্তায় তুমি পাল্টাতে পারতে তোমার নাম। কেননা তুমি একবারে যা বহন করতে পারো তার চেয়ে বেশি কোনো সম্পদে তোমার মালিকানা থাকতো না! যেখানে চাইলেই বিনে পয়সায় সব জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে ব্যক্তি—মালিকানার আবশ্যকতা কি?

সময়টা ছিলো এমন, যখন আমি একটা কাজের জন্যে দোরে দোরে ঘুরছিলাম। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলাম না কোথাও। তীব্র স্রোতা খালের মধ্যে লাইফ-বয়ার যে অবস্থা হয়, আমি যেন ছিলাম ঠিক সেই রকম। কিন্তু খালের তীরভূমি চোখে পড়ছিলো না। যেন তটভূমিটাই খালের তলায় ডুবে গেছে। আমি স্রোতের ধাক্কায় হাবুডুবু খাচ্ছিলাম যখন তখন। কিন্তু আশ্চর্য—পায়রার খোপের মতো ফুটোঅলা টেবিলটাই আমাকে টেনে তুললো!

টেবিলটা আমি পেতেছিলাম বসবার ঘরের ঠিক মধ্যিখানে। সম্পত্তিটা বাবার। গত পঞ্চাশ বছরের দর্জিগিরির যতো টুকিটাকিতে ঠাসা ছিলো ডেস্কটা। কতো পয়সা এসেছে জিনিসটার দরুন। এর বিচিত্র সব ড্রয়ারে কতো অদ্ভুত জিনিস ভরা ছিলো, তার সুমার হয় না। বাবা যখন অসুস্থ, কোনো কাজটাজ করতে পারেনা—ডেস্কটা তখনই আমার দখলে আসে। আর আমি এটিকে এখন ব্রুকলিনের মতো অভিজাত এলাকায় বাদামী পাথরের মর্যাদা-বান বাড়ির চারতলার পার্লারে সংস্থাপিত করেছি। অবশ্য এটাকে

এখানে বসাতে গিয়ে গ্যাঞ্জাম কম হয়নি আমার। ভাগ্যিস, বউয়ের বা আমার বাড়িতে আসার মতো কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিলো না, যাদের চোখে এ জিনিসটা পড়তে পারে।

আমি বাড়ির সব বাড়তি চেয়ার জড়ো করে সেই ডেস্কের চার পাশে বৃত্তাকারে বসালাম। তারপর টেবিলে পা তুলে, একটা চেয়ারের ওপর আয়েস করে বসলাম। ভাবতে লাগলাম, আমি যদি লিখতেই পারি, তাহলে কি নিয়ে লিখবো। আগে টেবিলটার এক পাশে লাগানো ছিলো একটা পেতলের পিকদান। জিনিসটার অস্তিত্ব যে এককালে সত্যিই ছিলো, তা প্রমাণ করার জন্যেই যেন আমি জায়গাটা লক্ষ্য করে যখন তখন থুথু ছিটিয়ে চললাম। টেবিলের ফুটো এবং দেরাজ সাতগুলোই এখন খালি। অতো বড়ো ডেস্কটার ওপর একখণ্ড সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

পনেরো

দাদাবাদীদের খুব রমরমা তখন। যাদেরকে অনতিবিলম্বে অনুসরণ করতে থাকে পরাবাস্তববাদীরা। উদ্ভব হবার দশবছর পার হবার আগে পর্যন্ত এদের নামও আমার কানে আসেনি। আমি কখনো কোনো ফরাসী বই পড়িনি ফরাসী চিন্তাধারা সম্পর্কেও কখনো ধারণা আমার ছিলোনা। আমি খুব সম্ভব ছিলাম মার্কিন—দাদাবাদী। তবে কিনা, ব্যাপারটা আমি নিজে জানতাম না।

আমি আমার লেখার টেবিলে বসেছিলাম দীর্ঘ প্রতিক্ষিত সেই মহৎ কর্মটি সম্পাদন করার জন্যে। মহৎ এবং কঠিন কর্ম। বন্ধুরা, কে কোথায় আছো। আমার বর্ণনা কি তোমাদের পরিচিত

বলে মনে হবে? আমার এই নতুন শুরুটাকে! আমাদের নতুন হয়ে ওঠার দরকার আছে এখনো। আমরা টেলিফোন, গাড়ি কিংবা উন্নতমানের বোমারু বিমান ছাড়া চলতে পারি। কিন্তু নতুন কিছু ছাড়া আমারা অচল। অথর্ব। অ্যাটলান্টিস কবে তলিয়ে গেছে পানির নিচে। কেবল মাত্র ধংসাবশেষ— কেননা নতুন কোনো ধারা বহমান থাকেনি ওইসব কীর্তিকলাপের সঙ্গে। বহমান থাকেনি বলেই ওগুলো আজ অতীতের স্মৃতি মাত্র। মেশিনটা একমিনিটের জন্যে থামাবে? ফিরে তাকাও ১৯১৮ সালের দিকে। কাইজার বসে আছেন ঘোড়ার পিঠে। তাঁর অহঙ্কারী গোঁফ জোড়াটা দেখেছো? দ্যাখো, তার অনুগত সারি সারি সুসজ্জিত কামান। যারা হুকুমের অপেক্ষায় আছে। আদেশের সঙ্গে সঙ্গে এক যোগে গর্জে উঠবে। এবার তাকাও অন্যদিকে। আমাদের মহান এবং গৌরবময় সভ্যতার ধারকরা শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে বলে প্রস্তুত। এদের ঘোড়া, পোষাক, পতাকা, বদ্‌লে দাও। এরা কারা? সেই কাইজারেরই সৈন্যদল। সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়া ওই লোকটাই কাইজার নয়? ওরাই কি সেই ভয়ঙ্কর হুন্‌!… বিগ্‌ বার্থা কোথায়? ও, আমি মনে করেছিলাম ওরা নোতর্‌দামে যাবার জন্যে প্রস্তুত। মানবতা, হ্যাঁ মিয়াভাই, মানবতা মার্চ করে যাচ্ছে!

খবর দাও পশ্চিমী ইউনিয়নকে। পদব্রজে কিংবা নৌকাযোগে পাঠাও একজন তরুণ বার্তাবহ। তাকে বলে দাও, মহৎ সৃষ্টি নিয়ে আসবার জন্যে। ওটা আমাদের খুব দরকার! আমাদের

নতুন যাদুঘর এখন প্রস্তুত। মহৎ সৃষ্টিটি নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেলোফেনে মুড়ে, ডিউই ডেসিমেল-পদ্ধতিতে ফাইল করে পরম যত্নে সাজিয়ে রাখা হবে। তা ওই মহৎ সৃষ্টির স্রষ্টা, অর্থাৎ লেখক-প্রবরের নাম কি? যদি তার নাম না-ও থাকে—সে মন্দ বা ভালো যাই-ই লিখুক না কেন; জীবিত বা মৃত সে যেরকম অবস্থাতেই থাকুক—তাকে নিয়ে এলে পঁচিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।

'জে নে পারলে পাস লজিক—জে পারলে জেনেরো যাইতে!' একটি ফরাসী মহাজন বাক্য। মনে হয় তুমি এটা শোনোনি। যেহেতু ভাষাটা ফরাসী। আমি এটার পুনরুক্তি করছি রানীর নিজস্ব ভাষায়, আই অ্যাম নট টকিং লজিক; আই অ্যাম টকিং জেনেরো সিটি। অর্থাৎ আমি যুক্তির কথা বলছি না বলছি উদারতার কথা। ইংরেজিতে কথাটা খুব বাজে শোনায়—এটা রানীর ভাষা হলেও কিন্তু বক্তব্যটা পরিস্কার।

উদারতা! শুনতে পাচ্ছো কাথাটা? কী যুদ্ধে কী শান্তিতে, তোমরা এই জিনিষটার চর্চা করোনি। তোমরা এর মানেই জানোনা। তোমরা উদারতা বলতে মনে করো বিজয়ীদের জন্যে সরবরাহ করা, বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেডক্রস-নার্সদের পাঠিয়ে দেয়া। উদারতা তোমাদের কাছে বিশ বছরের বিলম্বিত বোনাস। ছোট্ট পেনসন এবং হুইল-চেয়ার। একটা লোককে তার পুরনো চাকরিতে পুনর্বহাল করতে পারলেই তোমরা মনে করলে এটাই উদারতা! যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়, গাধার বাচ্চারা তাকি জানোনা? উদারতা

হচ্ছে একজন মুখ খুলবার আগেই হ্যাঁ বলা। আবার হ্যাঁ বলতে চাইলে প্রথমে তোমাকে হতে হবে একজন সারিয়ালিস্ট অথবা ডাডাইস্ট্। কেননা তুমি বুঝতে পেরেছো, 'না' বলবার অর্থাটা কি! এমনকি তুমি একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না বলতে পারো যদি যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু করবার ক্ষমতা তোমার থাকে।

বিব্রত হয়ো না যদি দ্যাখো, তোমার পড়শি ছুরি হাতে তার স্ত্রীর পেছনে ছুটছে। সম্ভবত এর পেছনে যথাযথ কারণ রয়েছে। তুমি যদি তোমার মনকে পরিশীলিত করতে চাও, লোকটাকে থামাও। মন কখনো পরিশীলিত করা যায়না। তোমার হৃদয়ের দিকে তাকাও—মেধার বসবাস সেখানেই, মগজে নয়। আহ্ আমি যদি জানতাম, তখনো বেঁচে আছেন সেন্দ্রার্স, ভাস, গ্রস, আর্নস্ট কিংবা অ্যাপোলিনীয়র। যদি আমি জানতাম, একই সময়ে ওরা যা ভাবছেন, তা হুবহু আমিও ভেবে চলেছি। ভাবতাম, আমি উড়ে গেছি। হ্যাঁ মনে হতো, বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়ে গেছি আমি। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। জানতাম না, পঞ্চাশ বছর আগে দক্ষিণ আমেরিকার এক ক্ষ্যাপা ইহুদী 'ডাউট্স ডার্ক উইথ দ্য ভারমুধ-লিপ্স'-এর মতো মোক্ষম বাক্যবন্ধের জন্ম দিয়েছেন। আর ওই একই সময়ে এক ফরাসী বালক লিখছে কী বিচিত্র পংক্তি '—ফাইণ্ড ফ্লাওয়ার্স দ্যাট আর চেয়ারস।' কিংবা 'মাই হাংগার্স ইজ দ্য ব্ল্যাক-এয়ার্স বিটস।' 'হিজ হার্ট অ্যাম্বার অ্যাণ্ড স্পাংক।' সম্ভবত একই সময়ে বা তার কাছাকাছি জ্যারি লিখলেন-'দ্য ইন ইটিং দ্য সাউণ্ড অফ মথ।' অ্যাপোলিনীয়র লিখলেন, 'নিয়ার এ জেন্টল-

ম্যান সোয়ালয়িং হিম সেল্‌স !' আর মর্মর ধ্বনি তুললেন ব্রেঁতো-
'নাইটস পেডাল্‌স মুভ আন ইন্টারাপটেড্‌লি।···
আমি ভাবছি, একটি উপন্যাস লেখার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে—কীভাবে তা লেখা হবে, তারই বর্ণনা। এটা হলো উপন্যাসের উপন্যাস। সৃষ্টির সৃষ্টি। অথবা ঈশ্বরের ঈশ্বর— ! 'ছুস দ্য দিউ' !

বেশি দিন আগের কথা নয়। নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছিলাম। প্রিয় পুরনো ব্রডওয়ে ! রাতের আকাশটা ছিলো নীলাভ। যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়—আমি যাচ্ছিলাম সেই খানটা দিয়েই। এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে তাকালাম সেই জানালাটার দিকে। লাল আলো জ্বলছে। সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বরাবরের মতোই। আমি একা। আমার চারি-দিকে লক্ষ লক্ষ লোক। সবাই যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ছে আমার ওপর। কাজেই আমি একক ভাবে তার কথা আর ভাবতে পারছি না। যে বইটি আমি লিখতে শুরু করেছি—আমি তার সম্পর্কে চিন্তা করলাম। এবং হ্যাঁ ওর চেয়ে বইটাই এখন আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল ওর চেয়ে নয় আমার সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে এই বইটি। বইয়ে কি আমি সত্যকে তুলে ধরতে পারবো। সমগ্র সত্যকে এবং কেবলই সত্যকে ! ঈশ্বর, সহায় হও। জনতার ভীড়ে পিষ্ট হতে হতে আমি যেন সেই প্রশ্নেই বিদ্ধ হচ্ছিলাম। বহুবছর যাবৎ আমি এই গল্পটি বলতে চেয়েছি এবং সব সময় সত্যের প্রশ্নটি আমাকে তাড়া করেছে

দুঃসপ্নের মতো। আমি সর্বদা সত্য কথা বলেছি। তবে সত্যও মিথ্যা বলতে পারে। সত্যই যথেষ্ট নয়। সত্য হচ্ছে সমগ্রের সারাংশ, যা মূলত অক্ষয়।

যখন আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো, সমগ্রের এই চিন্তাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সে যখন আমাকে পরিত্যাগ করে, তখন সম্ভবত সে ভেবেছিলো, অথবা বিশ্বাস করেছিলো, আমাদের দুজনের মঙ্গলের জন্যেই এটা দরকার। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম—সে আমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইছে। কিন্তু একে মেনে নেবার মতো সৎ-সাহস আমার আদপেই ছিলোনা।

তবে যখন আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে ছাড়াও তার চলতে পারে, যদিও তা সীমিত সময়ের জন্যে—তখন দমিত সত্যটাই যেন বহুগুণে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। এ আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাবহ অভিজ্ঞতা হলেও আমি এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত না-করে পারলাম না। যখন আমি সম্পূর্ণ রিক্ত—যখন নিঃসঙ্গতা বিশাল হয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, এই বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত দুর্দশার চেয়ে বড়ো প্রেক্ষিতে দেখা উচিত। আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম। লিখলাম—আমি তাকে হারিয়ে এতোই দুঃখিত যে তাকে নিয়ে একটি বই লিখতে শুরু করেছি। যে বইটা তাকে অমর করে রাখবে। এটা হবে এমন বই—যেরকমটি আগে আর কেউ লেখেনি!

নাচঘর পেরুবার সময়ও আবার সেই বইয়ের চিন্তা। হঠাৎ আমার

ম্যান সোয়ালয়িং হিম সেল্‌স !' আর মর্মর ধ্বনি তুললেন ব্রেঁতো-
'নাইটস পেডাল্‌স মুভ আন ইন্টারাপটেড্‌লি।···
আমি ভাবছি, একটি উপন্যাস লেখার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে—কীভাবে তা লেখা হবে, তারই বর্ণনা। এটা হলো উপন্যাসের উপন্যাস। সৃষ্টির সৃষ্টি। অথবা ঈশ্বরের ঈশ্বর—! 'দুস দ্য দিউ'!

বেশি দিন আগের কথা নয়। নিউ ইয়র্কের রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটছিলাম। প্রিয় পুরনো ব্রডওয়ে! রাতের আকাশটা ছিলো নীলাভ। যেখানে আমাদের প্রথম দেখা হয়—আমি যাচ্ছিলাম সেই খানটা দিয়েই। এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে তাকালাম সেই জানালাটার দিকে। লাল আলো জ্বলছে। সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি বরাবরের মতোই। আমি একা। আমার চারি-দিকে লক্ষ লক্ষ লোক। সবাই যেন হুড়মুড় করে এসে পড়ছে আমার ওপর। কাজেই আমি একক ভাবে তার কথা আর ভাবতে পারছি না। যে বইটি আমি লিখতে শুরু করেছি—আমি তার সম্পর্কে চিন্তা করলাম। এবং হ্যাঁ ওর চেয়ে বইটাই এখন আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল ওর চেয়ে নয় আমার সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে এই বইটি। বইয়ে কি আমি সত্যকে তুলে ধরতে পারবো। সমগ্র সত্যকে এবং কেবলই সত্যকে! ঈশ্বর, সহায় হও। জনতার ভীড়ে পিষ্ট হতে হতে আমি যেন সেই প্রশ্নেই বিদ্ধ হচ্ছিলাম। বহুবছর যাবৎ আমি এই গল্পটি বলতে চেয়েছি এবং সব সময় সত্যের প্রশ্নটি আমাকে তাড়া করেছে

দুঃসপ্নের মতো। আমি সর্বদা সত্য কথা বলেছি। তবে সত্যও মিথ্যা বলতে পারে। সত্যই যথেষ্ট নয়। সত্য হচ্ছে সমগ্রের সারাংশ, যা মূলত অক্ষয়।

যখন আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো, সমগ্রের এই চিন্তাটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সে যখন আমাকে পরিত্যাগ করে, তখন সম্ভবত সে ভেবেছিলো, অথবা বিশ্বাস করেছিলো, আমাদের দুজনের মঙ্গলের জন্যেই এটা দরকার। আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলাম—সে আমার কাছ থেকে অব্যাহতি চাইছে। কিন্তু একে মেনে নেবার মতো সৎ-সাহস আমার আদপেই ছিলোনা।

তবে যখন আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে ছাড়াও তার চলতে পারে, যদিও তা সীমিত সময়ের জন্যে—তখন দমিত সত্যটাই যেন বহুগুণে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। এ আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাবহ অভিজ্ঞতা হলেও আমি এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত না-করে পারলাম না। যখন আমি সম্পূর্ণ রিক্ত—যখন নিঃসঙ্গতা বিশাল হয়ে উঠলো, হঠাৎ আমার মনে হলো, এই বেঁচে থাকা ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত দুর্দশার চেয়ে বড়ো প্রেক্ষিতে দেখা উচিত। আমি তাকে চিঠি লিখতে বসলাম। লিখলাম—আমি তাকে হারিয়ে এতোই দুঃখিত যে তাকে নিয়ে একটি বই লিখতে শুরু করেছি। যে বইটা তাকে অমর করে রাখবে। এটা হবে এমন বই—যেরকমটি আগে আর কেউ লেখেনি!

নাচঘর পেরুবার সময়ও আবার সেই বইয়ের চিন্তা। হঠাৎ আমার

মনে হলো, আমরা জীবন সায়াহ্নে এসে হাজির হয়েছি। আমি আবিষ্কার করলাম, আমি যে বইয়ের পরিকল্পনা করেছি তা মূলত তার সমাধির জন্যে নির্মিতব্য এক স্মৃতি স্তম্ভ। এবং আমার নিজের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য। কেননা আমিও তো তারই ছিলাম একদিন। এই ভাবনাটা অবশ্য কিছুদিন আগেকার। তার পর পরই আমি আবার লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। কাজটা এতো কঠিন কেন? কঠিন এজন্যে যে এক সময় এর সমাপ্তি টানতে হবে—এবং কোনো কিছু 'শেষ' হবার ধারণা আমার কাছে অসহ্য।

লেখার পথে আমি অগ্রসর হচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন দিক-নির্দেশনায়। আমি যেন সেই বিশ্ব-পর্যটক—যে এমনকি কম্পাসও সঙ্গে নেয়নি। দীর্ঘ স্বপ্ন-কল্পনার ফলে গল্পটা বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করেছে। যেন এক সুরক্ষিত নগরী—যেখানে খোদ আমিই একজন বহিরাগত। গোলক ধাধায় ঘুরে ক্লান্ত। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারছি না প্রধান তোরণ পার হয়ে। মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন সে এক ভৌতিক দুর্গ নগরী। আকাশ থেকে বিশাল সাদা রাজহংসীরা সার বেধে নেমে আসছে সেনাদলের মতো। তাদের নীল-সাদা পাখার ঝাপ্টায় তারা যেন আমার চোখ থেকে মুছে ফেলবে স্বপ্নের কণাগুলো। আমি ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছি না। পায়ের নিচে খুঁজে পাচ্ছিনা দাঁড়াবার মতো মাটি। পেলেও পরক্ষণে হারিয়ে ফেলছি। আমি খুঁজছি একটুখানি দাঁড়াবার মতো জায়গা—যেখান থেকে আমি দেখাতে পারি আমার জীবনের রূপ। আমার পেছনে

দুর্বোধ্য এক পথ নির্দেশক। সেটি যে কোন্ দিকে কি নির্দেশ করছে, তা বোঝা অসম্ভব। তা, দিক-নির্দেশটি দেখতে কীরকম? এ যেন ছট ফট করতে থাকা একটা মুরগি—যার মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে!

জীবনের বিচিত্র গড়নের কথা যখন আমি বলতে চাই, তখন সেই মেয়েটির কথাই আমার মনে পড়ে, যাকে আমি প্রথম ভালোবেসেছিলাম। আমার তখনকার অভিজ্ঞতা যুগপৎ বিচিত্র ও বিয়োগান্তক। সম্ভবত দুই অথবা তিনবার তাকে চুম্বন করে তৃপ্তি পেয়েছিলাম। সেই চুম্বন যা কেবল সংরক্ষিত থাকে দেবীদের জন্যেই। সে হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি—কেবল তাকে এক পলক দেখবার জন্যে আমি রাতের পর রাত তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি—রাস্তা পেরুবার সময়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, জানালায় সে কখনো এসে দাঁড়ায়নি সেই সময়। তাকে চিঠি লিখিনি কেন? কেনই বা করিনি টেলিফোন? একবার তাকে নিয়ে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। সেদিন ওদের বাড়িতে যাবার সময় ওর জন্যে আমি একগুচ্ছ ফুল নিয়ে যাই। কোনো মহিলার জন্যে ফুল নিয়ে যাওয়া আমার জীবনে সেই প্রথম। আমরা যখন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ তার হাত থেকে ফুলগুলো পড়ে গেলো। আমি চকিতে উবু হলাম ফুলগুলোর দিকে। সে আমাকে ফুলগুলো কেবল জড়ো করতে বললো। সে তুলে নেবে। ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে তার সেই অপ্রস্তুত-হাসির কথা আমার মনে পড়ে -কী মলিন, কী মধুর সে হাসি।

প্রেমের পরিনতি ছিলো ব্যর্থ। শেষটায় আমি দৌড়ে পালালাম। আসলে আমি অন্য এক মহিলার কাছ থেকে পালাচ্ছিলাম। কিন্তু শহর ছাড়বার আগের দিন ইচ্ছে হলো, একবার তাকে দেখে যাই। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বাড়ির সামনে এলো। বললো—তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। সে যেভাবে কথা বলছিলো, তাতে মনে হলো, বিয়ে সুখেরই হবে। কিন্তু আমি অন্ধ ছিলাম বলেই ভাবলাম, যতোটা সুখ সে পাবে বলে ভেবেছে—ততো সুখী সে হবে না। ভাগ্যিস কথটা আমি তাকে বলে ফেলিনি। তাহলে আমার মতো, এ লোকটাকেও সে ছেড়ে দিতো। এমনকি সে আমার সঙ্গেই আবার চলেও আসতে পারতো। আমি নিজেকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলাম। আমি উচ্চারণ করলাম, 'বিদায়!' তারপর একটা মরা মানুষের মতোই নেমে গেলাম রাস্তায়। পরদিন ভোর বেলাতেই রওয়ানা হলাম উপকূলের উদ্দেশ্যে। নতুন জীবন শুরু করতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ!

আমার নতুন জীবনটাও ছিলো ব্যর্থ, যার ইতি ঘটলো চুলা ভিস্‌তার খামার বাড়িতে। নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ বলে মনে হলো আমার। সেখানে একটি মেয়েকে আমি ভালোবেসে-ছিলাম। আরো এক মহিলাও সেখানে ছিলো, যাকে আমি মনে করতাম করুণার পাত্র। মহিলার সঙ্গে আমি ছিলাম তিন বছর। কিন্তু আমার মনে হতো সারাটা জীবন ধরেই আছি। আমার বয়েস তখন একুশ। আর তার সম্ভবত ছত্রিশ। যখনই আমি তার দিকে তাকাতাম, মনে হতো, আমার বয়েস যখন হবে ত্রিশ, তখন

তার হবে পঁয়তাল্লিশ। আমার যখন চল্লিশ, তার পঞ্চান্ন। যখন আমি পঞ্চাশে পা দেবো, তখন ওর বয়েস দাঁড়াবে ছেষট্টি!

তার চোখের নিচে ছিলো সূক্ষ্ম কুঞ্চণ। হাসিতেও। কিন্তু কুঞ্চণ কুঞ্চনই। যখন আমি তাকে চুমো খেতাম সেগুলো আরো বড়ো হতো। সে সহজেই হাসতো। কিন্তু তার চোখ দুটি ছিলো বিষন্ন। খুবই বিষন্ন। এক জোড়া আর্মেনীয় চোখ। তার চুলগুলোও ক্রমে লালচে থেকে সোনালি হয়ে আসছিলো। এসব সত্ত্বেও সে ছিলো রূপসী। বস্তুতঃ একজন মহিলার যা কিছু থাকা দরকার সবই ছিলো তার। কেবল বয়েসের ওই পনেরো বছরের ব্যবধানটাই ছিলো একমাত্র ব্যতিক্রম। এই ব্যবধান আমাকে পাগল করে তুলেছিলো। তার ছেলের বয়েস ছিলো প্রায় আমার সমান। ছেলেটা যেদিন মায়ের কাছে শুতো, আমরা সেদিন ঠাঁই নিতাম রান্নাঘরে। তারপর ভেতর থেকে চাবি মেরে দিতাম দরজায়। সরু টেবিলের ওপর সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তো। এবং আমি উপুর হয়ে তার ওপর।

আমি প্রতিবারই বলতাম, এবারই শেষ। কিন্তু সকালে ওর ছেলে কাজে বেরিয়ে গেলে আমি বিছানা শুকোতে ছাদে চলে যেতাম। মা ও ছেলে দুজনেরই ছিলো যক্ষ্মা। আমি প্রায়ই সুযোগ খুঁজতাম পালিয়ে যাবার। কিন্তু সুযোগ পেলেও কী জানি কেন পালাতাম না। আমার কেবল বারবার মনে হতো, আমি চলে গেলে সে ওই বড়ো বড়ো বিষন্ন চোখ দুটি মেলে আমার ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকবে। আমি আবার তার কাছে আত্মসমর্পন করতাম। যেন

একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করছি আমি।

ওকে জড়িয়ে শুয়ে আমি প্রায়ই চিন্তা করতাম আর একজনের কথা। সেই একজন, যাকে আমি ভালোবাসতাম। সে-ও যদি আজ আমার পাশে এইভাবে শুয়ে থাকতো?

৩৬৫ দিন। এক বছর। আমার সেই দীর্ঘ পরিক্রমণ অন্য এক মহিলার পাশে শুয়ে তাদের সবার কথাই আমার মনে পড়ে এখন। সেই জীবন থেকে কতোদিন হয়ে গেলো মুক্তি পেয়েছি আমি। মানুষের তৈরী সবচেয়ে কালো ও কুচ্ছিত সেই পথগুলোয় কতোকাল ধরে আমি হাঁটিনা। কী তীব্র মানসিক যাতনা নিয়েই যে সেই ভ্রমণ! সেই রাস্তা, সেই প্রথম আশা ভঙ্গ! সব, সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলে এসেছি এই নির্জনতার মধ্যে। জানালাটা নিশ্চয়ই এখনো তেমনি রয়েছে। কিন্তু মেলিসান্দে সেখানে নেই। নক্ষত্র ওঠে। হাইড্রা-মুখো কুকুরটা এখনো দেখা দেয় নৈশাকাশে। আমি ব্যাঙের ডাক শুনতে পাই কান পাতলেই। একঘেয়ে বাড়ির সার আর গাড়ির বহর। সে লুকিয়ে আছে পর্দার আড়ালে। অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। সে এটা করছে, ওটা করছে। কিন্তু সে সেখানে নেই। কখনো থাকবে না, কখনো না, কখখনো না! একি?

এ হচ্ছে আমাতোর বিদীর্ণ ফুস ফুস, এর নাম রুবাইয়াৎ! এ হচ্ছে এভারেস্ট পর্বত-শৃংগ, অমাবশ্যার রাত। এটি হচ্ছে এক সুবোধ বালকের বিশ্বাস···খেঁক শোয়াল! ···আদি অন্তহীন! হৃদয়ের নিচে, গলার পেছনে পায়ের পাতায় এর শুরু! পুনরুক্তিময় প্রারম্ভ। ···এবং কেবল একবার, একটিবার যীশুর ভালোবাসার দোহাই,

জানালার পর্দার ওপর একটা ছায়া মাত্র অথবা একটি দীর্ঘশ্বাস··· যদি মিথ্যেও হয় ; তবুও ছায়াটা দুলে উঠুক এই যন্ত্রনার উপশমের জন্যে। এই অবিশ্রাম ভ্রমণ স্থগিত করার জন্যে। কেবল একটিবার। ···বাড়ির পথে হেঁটে যাওয়া। একই বাড়ি ঘর, একই রকম ল্যাম্প-পোস্ট, একই ধরনের সব কিছু। হাঁটতে হাঁটতে আমি আমার নিজের বাড়ি পেরিয়ে যাই। পার হই গোরস্থান, গ্যাস-ট্যাঙ্ক, রিজার্ভয়ের। খোলামেলা গ্রাম। আমি রাস্তার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে থাকি। কী দরিদ্র আমি। কী দুঃখী।···অথচ আমারই না পর্বত গড়ে তোলার কথা।

ষোলো

তখন আর একজন প্রতীক্ষা করছে! আমি দিব্যচোখে দেখতে পাই, সে আমার জন্যে অপেক্ষায় আছে। তার চোখ দু'টো বিষণ্ণ ও আয়ত। মুখটা ফ্যাকাসে। অপেক্ষায় উদ্বেগে কম্পমান। আমি ভাবতাম, তার আকুলতাই আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এখন, যে মুহূর্তে আমি তার দিকে হেঁটে যাচ্ছি এবং তার চোখের দিকে তাকাচ্ছি, তখন সেসবের কিছুই তো আমি দেখছি না। তাহলে? তাহলে আমাকে এমন ফিরিয়ে আনে কোন্ শক্তি? আমি জানিনা।

আমি তোমাকে ভালোবাসিনা। —আমার এই আর্তি কি সে শুনতে পায়? কি করে শুনবে? আমি যখন আমার এই সংলাপটি প্রচণ্ড স্বরে উচ্চারণ করি, তখন আমার ঠোঁট যে বন্ধ থাকে! আমার বয়েস তখন ত্রিশ। স্ত্রী সন্তান এবং একটি দায়িত্বপূর্ণ চাকরি নিয়ে আমার ঘর-সংসার। সত্য এইগুলোই। এবং সত্য মূলত কিছুই না। সত্য যা তা হলো আমার অতি উচ্চাশা—এবং এটাই মূল বাস্তবতা। এটা এমন একটা সময় যখন মানুষের কোনো কাজই পরিপক্ক নয়। এটা এমন একটা সময়, যখন মানুষ কেবল পরিণত হতে যাচ্ছে দেবদূতে। দেবদূতদের মাহাত্ম্য কোথায়? পবিত্রতায়? না কি তাদের উড্ডীন হবার ক্ষমতায়? একজন দেবদূত যে কোনো মুহূর্তে বদ্‌লে দিতে পারে যেকোন আঙ্গিক। এসব কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আমার মনে-হলো, আমি ছিলাম শুদ্ধ ও অমানবিক গুণ সম্পন্ন। আমার পাখা ছিলো। অফিস থেকে বেরুবার সময় পাখা দু'টো আমি গুটিয়ে কোটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলতাম!

থিয়েটারের প্রবেশ পথের উল্টো দিকেই ছিলো নাচ ঘর। আমি কাজ খুঁজতে না বেরিয়ে দুপুরবেলা ওই জায়গাতেই বসে থাকতাম চুপচাপ। এটা ছিলো নাটুকে পাড়া। এবং এখানে বসে বসে নিষিদ্ধ সব স্বপ দেখতাম। সারা নিউ ইয়র্কের তাবৎ থিয়েটারী মহল এখানেই এসে একত্রিত হয়েছে একটি রাস্তায়। নাম ব্রড-ওয়ে। আর ব্রডওয়ে মানেই তো সাফল্য, খ্যাতি, চাকচিক্য আর রঙের বাহার। ব্রডওয়ে মানে অ্যাসবেস্টসের বেড়া এবং

বেড়ার মধ্যে ফুটো। থিয়েটারের সিঁড়িতে বসে আমি বিপরীত দিকের ডান্স-হলের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেখানে এমনকি গ্রীষ্মের দুপুরেও জ্বলে উঠতো লাল লণ্ঠন। প্রতিটি জানালার সঙ্গেই ছিলো ভেন্টিলেটার—যার ফাঁক দিয়ে ভেতরের সঙ্গীত-সুধা বাইরের রাস্তায় গিয়ে পিছলে পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তা হারিয়ে যাচ্ছে যানবাহনের কোলাহলের ভেতর।

নাচঘরের উল্টো দিকে ছিলো বিশ্রামাগার। এবং সেখানেও আমি যখন তখন ঢুঁ মারতাম। কোনো মেয়ে টেয়ে যদি মিলেই যায়? ছোট্ট ঘরটার পাশেই রাস্তা ঘেঁষে দাঁড় করানো ছিলো একটা কিয়োস্ক্! তাতে সাঁটানো ছিলো বিদেশী পত্র পত্রিকার বিজ্ঞাপন। পত্রিকাগুলোর চেহারা, সেগুলোর অজানা, অদ্ভুত ভাষা আমাকে সারা দিনের জন্যে অন্যমনস্ক করে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। সম্পূর্ণ বিনা-অনুমতিতে আমি উঠে যেতাম নাচঘরের রোয়াকে। সেখানে দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট জানালা। নিক নামের এক গ্রীক সেখানে টিকেটের গুচ্ছ সামনে নিয়ে বসে থাকে। নিচের প্রস্রাবখানা এবং সিঁড়ির ধাপগুলোর মতো, নিকের হাতটাকেও আমার কাছে মনে হয় তার শরীর থেকে আলাদা কোন বস্তুর মতো। ওর অস্বাভাবিক লোমশ হাতখানা যেন কোনো স্ক্যাণ্ডিনেভীর রূপ-কথার পাতা থেকে সরাসরি উঠে এসেছে। একটা অবাক হাত। এবং সবাক-হাতও বটে! কেননা তার হাতই আমাকে বলতো মিস মারা আজ রাতে এখানে আসবেন না—অথবা, হ্যাঁ, মিস মারা এখানে আসবেন আজ রাত্রে। তবে কিনা—একটু দেরীতে।

অনেক রাত্রে আমি ঘুমের ভেতরে স্বপ্নে দেখতাম সেই হাতখানাকে। আমার সুন্দর স্বপগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটতো সেই রোমশ দৈত্যটার—যে জানালার শিক ধরে দাঁত খিঁচোতো। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরে যেতো আমার ঘর আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতো হঠাৎ। দেখতাম, বাড়িটা কী অন্ধকার, আর ঘরটা কী নিঃশব্দ! মরাল গ্রীবা মেয়েটির বয়েস বোঝা দুস্কর ছিলো। আঠারো থেকে ত্রিশ- এর যে কোনোটাই হতে পারে। কালো চুল, ষড়োসড়ো মুখ। চোখ দুটো ছিল অসম্ভব উজ্জল। এক পাশে সিঁথি করে ছেলেদের মতো করে আঁচড়াতো সে। আমি এতদিন পর যেন আবিষ্কার করতে পারছি তার সৌন্দর্য। মনে আছে, আমি সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে তাকে হাত-ইশারায় ডাক দিয়েছিলাম। সে আমার দিকে এগিয়ে এসেছিলো পাল তোলা নৌকার মতো। ওর হাসিটা ছিলো আকর্ষণীয় ও রহস্যময়—যা দিয়ে ও আমাকে আপ্যায়িত করে।

ওর মুখটার সত্যি তুলনা হয়না। বলা যায়, সারা দেহের সৌন্দর্য সৃষ্টি উপেক্ষা করে স্রষ্টা কেবল পূর্ণ-মনোযোগে ওর মুখটাই তৈরী করেছিলেন। আমি কেবল ওর মাথাটা পেলেই খুশি মনে তা বগলদাবা করে বাড়ি ফিরতে পারতাম। রাত্রে আমার বালিশের পাশে, আর একটা বালিশের ওপর ওটা রেখে দিতাম এবং রাতভোর মাথাটার সঙ্গেই প্রেম করতাম! তার সঙ্গে আমার যৌনসঙ্গম হলো বিশ্রামাগারেই। স্মরণীয় সঙ্গম! শ্লাভ-সুলভ চিবুক তুলে সে কতো কথাই যে এক নাগাড়ে বলে গেলো। রেস্তোরা

থেকে বেরিয়ে সে বললো, এবার তাহলে উঠি। বলতে বলতে সে তার ফার-কোট তুলে নিলো কাঁধে। চোখে পড়লো কালো চশমা। হাতে নিলো ব্যাগটা। যেন এতোক্ষণ পরে সে ফুটে উঠলো ম্যাগনোলিয়ার মতো।

ঃ এবার উঠি। শব্দটা যেন ধ্বনিত হতে থাকলো চরাচরে।

ক্যাবের কাছে এসে স্পিকিং-টিউবে মুখ রেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম চলো বেড়িয়ে পড়ি ক্যাবে, নৌকায়, ট্রেনে, ন্যাপথা-লঞ্চে। যাই সমুদ্রতীরে। ছারপোকা ভরা বিছানা···মহা-সড়ক···ধ্বংসাবশেষ, পুরনো পৃথিবী, নতুন পৃথিবী, পীয়োর, জেটি, হাই-ফরসেপ, চলমান ট্র্যাপিজ···গহ্বর, বদ্বীপ, কুমীর, কামট, কথা, কথা, আরো কথা, আবার রাস্তা···আরো ধুলো, আরো বর্ণধনু, আরো বর্ষণ !··· আরো প্রাতঃরাশ, আরো ক্রীম, আরো লোশন। আর যখন পরিক্রমণ শেষ হবে এবং পথের ওপর পড়ে থাকবে আমাদের মৌলবাদী পদচিহ্ন—সেখানে চির জাগরূক থেকে যাবে তোমার মস্তবড়ো সাদা ও সুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবি !···

আজ রোববার। আমার নতুন জীবনের প্রথম রোববার। আমি গলায় পরেছি নতুন বেড়ি। বিশ্রামের দিন দিয়েই আমার নতুন জীবনের শুরু। আমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছি প্রশস্ত একটি সবুজ পাতার ওপর। লক্ষ্য করছি, সূর্য তোমার জরায়ুতে বিস্ফোরিত হচ্ছে। আমি বাতিলের মতো পড়ে আছি চাঁদের ওপর। পৃথিবীটা পড়ে আছে একটা জরায়ু-সদৃশ খাদের মধ্যে বাইরের এবং ভেতরের অহম্ এখন সাম্যাবস্থায়। মনে

হচ্ছে, আমি ২৫,৯৬০ বছর যাবৎ ঘুমিয়ে আছি যৌনতার কালো জরায়ুতে। বোধহয় আমি নির্দিষ্ট সময়ের ৩৬৫ বছর বেশি ঘুমিয়েছি! কিন্তু মরিয়ার মতো আমি পৌঁছেছি এসে সঠিক অবস্থানে। আমার পেছনে কুয়ো—সামনেও কুয়ো। তুমি আমার কাছে এসেছো ভেনাসের মতো। ভেনাসেরই মনোবেদনা বহন করে। আজ আমি আছি একটা ভারসাম্যের মধ্যে। জানি, আগামী কালই এই সাম্যাবস্থার অবসান ঘটবে! আবার যদি তা আমি ফিরে পাই, তা থাকবে আমার রক্তে—রাশিতে নয়!

আমি দীর্ঘকাল বসবাস করেছি সূর্যের ছায়ায়! এখন চাই আলো। সংকল্পে চাই সৌর—আগুন। আমি চাই আমার পরিক্রমার সমাপ্তি—যেন গ্রহচ্যুত অবস্থায় অনন্ত শূন্যে আবর্তিত হতে না হয় আমাকে। ···তোমার সব কিছু বিশ্বাস করি। ···তাই তো তোমাকে গ্রহনও করি একটা রাশি ও ফাঁদ হিসেবে। এক অন্ধ বিচারক হিসেবে—পতিত হবার গর্ত হিসেবে, চলবার একটি পথ হিসেবে। একটি ক্রশ্ এবং তীর হিসেবে। আমি শেষ মুহূর্ত অব্দিও পরিভ্রমণ করেছি সূর্যের বিপরীত দিকে।

আমার চোখ এবং মনের সম্মুখে এক অনন্ত—'দুই'! এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয় আর বস্তু দুই ভাগে বিভক্ত। দুই আকাশ, দুই লিঙ্গ···সব ঘটনাই দুবার ঘটে! আমি আজ্ঞা করবো না, আজ্ঞাবহ হবো না। আমি আবার তাকালাম সূর্যের দিকে। আমার প্রথম পূর্ণাবলোকন। সূর্যটা টকটকে লাল···ছাদের ওপর মানুষের চলাচল···তাদের সিলুয়েট! দিগন্তের সবকিছুই আমার কাছে এখন

পরিস্কার। এ যেন ইস্টারের রোববার। আমার পেছনে মৃত্যু—এবং জন্মও।

আমি যাপন করতে যাচ্ছি পিগমীদের আধ্যাত্মিক—জীবন। অরণ্যের আদিমতার ক্ষুদে মানুষদের গোপন জীবন। ভিতর এবং বাহির···স্থান পরিবর্তন করছে। লক্ষ্য এখন আর সাম্যাবস্থার নয়—আমাকে আবার শুনতে দাও তোমার সেই উজ্জ্বল বস্তুনিচয়ের কথা, যা তুমি বহন করো তোমার অভ্যন্তরে। যখন সূর্য তোমার জরায়ুতে বিস্ফোরিত হয়, তখন আমাকে তুমি পচতে দিয়োনা। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি তোমাকে গ্রহণ করছি আত্মার বিধ্বংসী শক্তি হিসেবে। তুমি এসো, হে আমার বহু বাঞ্ছিতা, হে রাত্রির মহারাণী! দেখাও তোমার জরায়ুর বিস্তার, যাতে তোমার কথা আমি কখনো ভুলে না যাই!

আর, আমরা অবশ্যই এগিয়ে চলবো। এগিয়ে চলবো, এগিয়ে চলবো। আগামীকাল এবং আগামীকালের দিকে।
